"যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবন-স্থলে !"

দরিদ্র নলিনীও সারদাকে বলিতে পারিতেন,—বোধ হয় মনে মনে বলিতেন,—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী, যার খুসী তার !"

নলিনী "সাহিত্যে" অনেকগুলি সুন্দর গল্প লিখিয়াছিলেন। আজকাল মোপাঁসা ভাজা, মোপাঁসা চচ্চড়ি, মোপাঁসার ছেঁচ্‌কী, মোপাঁসার ছ্যাঁচ্‌ড়ার ছড়াছড়ি হইয়াছে। কিন্তু নলিনীই প্রথমে বাঙ্গালীকে মোপাসার গল্পের আস্বাদ দিয়াছিলেন।

আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রবন্ধটি লইয়া বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে যাত্রা করিলাম। ইহার পূর্ব্বে দুই চারিবার বঙ্কিমবাবুর পরামর্শ পাইয়া উপকৃত ও চরিতার্থ হইয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন,—"আজ রাখিয়া যাও। কাল কি পরশু আসিও।"

দুই দিন পরে অপরাহ্নে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণের বৈঠকখানায় জানালায় দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু কাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন। আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম; বঙ্কিমবাবু ফিরিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "বসো।" তাহার পর আবার দক্ষিণমুখো হইয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে লাগিলেন। দেখিলাম, পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর ঢাকা বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের মেয়ে—যেন শিশিরস্নাত ক্ষুদ্র যূঁই। মেয়েটি হাসিতেছে, বঙ্কিমবাবু হাসিতেছেন। ক্ষুদ্র শিশুর সহিত শিশু হইয়া বঙ্কিমবাবু খেলা করিতেছেন! মেয়েটি যাইবার সময় বলিল, "সাধের তরণী আমার কে

দিল তরঙ্গে!" বঙ্কিমবাবু প্রফুল্লচিত্তে স্মিতবিকশিতমুখে এক-খানি সোফায় বসিলেন,—আমাকে বলিলেন, "মেয়েটি আমার সই!"

পাশের ঘরে হারমোনিয়ম বাজিতেছিল। আমি অন্যমনস্ক হইয়া শুনিতেছিলাম। বঙ্কিমবাবুর কথা শুনিয়া তটস্থ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমার বড় নাতি হারমোনিয়ম বাজাইতেছে। আমি নাতিদের সঙ্গে খেলাধূলা করি। হারমোনিয়ম কিনিয়া দিয়াছি। বাড়ীতেই বাজায়, গায়, আনন্দ করে। আমি উহাদের বাহিরে যাইতে দিই না। তুমি বাজাইতে পার?"

আমি বলিলাম, "না।"

"গান বাজনা তোমার ভাল লাগে না?"

"আমি খুব ভালবাসি।"

"তবে শেখ না কেন?"

অনেক জিনিস ভালবাসিতাম, কিছুই ত শিখিতে পারি নাই! কি উত্তর দিব?

দাদামহাশয়েরা অনেক চেষ্টা করেন, হারমোনিয়মও কিনিয়া দেন; পণ্ডিত, মাষ্টার, উপদেশ—চেষ্টা—যত্ন, কিছুরই ত্রুটী হয় না। কিন্তু তাঁহারা বিধিলিপি মুছিয়া দিতে পারেন না। কল্পনায় ভবিষ্যৎ গড়িয়া দেন, কিন্তু প্রাক্তন বর্ত্তমানও গড়ে, ভবিষ্যৎও গড়ে। আজ দিব্যেন্দুর 'দাদা' আর আমার দাদাম'শায়ের কথা এক সঙ্গে মনে হইতেছে। তাঁহাদের কত যত্ন, কত চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি হইয়াছে। তাঁহাদের কত আশা বিফল করিয়াছি। কিন্তু বিনিময়ে কি পাইয়াছি? সে সম্ভাবনা কি আর ফিরিবে? তাহার বিনিময়ে আজ যে সর্ব্বস্ব—জীবন দিতে পারি!

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমার সেই প্রবন্ধ পড়িয়াছি।"

"আপনার কি মত?"

"তুমি সম্পাদক,—তোমার মত কি আগে শুনি?"

"যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবন-স্থলে!"

দরিদ্র নলিনীও সারদাকে বলিতে পারিতেন,—বোধ হয় মনে মনে বলিতেন,—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী, যার খুসী তার!"

নলিনী "সাহিত্যে" অনেকগুলি সুন্দর গল্প লিখিয়াছিলেন। আজকাল মোপাঁসা ভাজা, মোপাঁসা চচ্চড়ি, মোপাঁসার ছেঁচ্‌কী, মোপাঁসার ছ্যাঁচ্‌ড়ার ছড়াছড়ি হইয়াছে। কিন্তু নলিনীই প্রথমে বাঙ্গালীকে মোঁপাসার গল্পের আস্বাদ দিয়াছিলেন।

আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রবন্ধটি লইয়া বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে যাত্রা করিলাম। ইহার পূর্ব্বে দুই চারিবার বঙ্কিমবাবুর পরামর্শ পাইয়া উপকৃত ও চরিতার্থ হইয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন,—"আজ রাখিয়া যাও। কাল কি পরশু আসিও।"

দুই দিন পরে অপরাহ্নে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণের বৈঠকখানায় জানালায় দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু কাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন। আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম; বঙ্কিমবাবু ফিরিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "বসো।" তাহার পর আবার দক্ষিণমুখো হইয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে লাগিলেন। দেখিলাম, পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর ঢাকা বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের মেয়ে—যেন শিশিরস্নাত ক্ষুদ্র যূঁই। মেয়েটি হাসিতেছে, বঙ্কিমবাবু হাসিতেছেন। ক্ষুদ্র শিশুর সহিত শিশু হইয়া বঙ্কিমবাবু খেলা করিতেছেন! মেয়েটি যাইবার সময় বলিল, "সাধের তরণী আমার কে

দিল তরঙ্গে!” বঙ্কিমবাবু প্রফুল্লচিত্তে স্মিতবিকশিতমুখে এক-খানি সোফায় বসিলেন,—আমাকে বলিলেন, “মেয়েটি আমার সই!”

পাশের ঘরে হারমোনিয়ম বাজিতেছিল। আমি অন্যমনস্ক হইয়া শুনিতেছিলাম। বঙ্কিমবাবুর কথা শুনিয়া তটস্থ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “আমার বড় নাতি হারমোনিয়ম বাজাইতেছে। আমি নাতিদের সঙ্গে খেলাধূলা করি। হারমোনিয়ম কিনিয়া দিয়াছি। বাড়ীতেই বাজায়, গায়, আনন্দ করে। আমি উহাদের বাহিরে যাইতে দিই না। তুমি বাজাইতে পার?”

আমি বলিলাম, “না।”

“গান বাজনা তোমার ভাল লাগে না?”

“আমি খুব ভালবাসি।”

“তবে শেখ না কেন?”

অনেক জিনিস ভালবাসিতাম, কিছুই ত শিখিতে পারি নাই! কি উত্তর দিব?

দাদামহাশয়েরা অনেক চেষ্টা করেন, হারমোনিয়মও কিনিয়া দেন; পণ্ডিত, মাষ্টার, উপদেশ—চেষ্টা—যত্ন, কিছুরই ত্রুটী হয় না। কিন্তু তাঁহারা বিধিলিপি মুছিয়া দিতে পারেন না। কল্পনায় ভবি-ষ্যৎ গড়িয়া দেন, কিন্তু প্রাক্তন বর্ত্তমানও গড়ে, ভবিষ্যৎও গড়ে। আজ দিব্যেন্দুর ‘দাদা’ আর আমার দাদাম’শায়ের কথা এক সঙ্গে মনে হইতেছে। তাঁহাদের কত যত্ন, কত চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি হই-য়াছে। তাঁহাদের কত আশা বিফল করিয়াছি। কিন্তু বিনিময়ে কি পাইয়াছি? সে সম্ভাবনা কি আর ফিরিবে? তাহার বিনিময়ে আজ যে সর্ব্বস্ব—জীবন দিতে পারি!

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “তোমার সেই প্রবন্ধ পড়িয়াছি।”

“আপনার কি মত?”

“তুমি সম্পাদক,—তোমার মত কি আগে শুনি?”

"আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আমার মতের মূল্য কি? আপনার মত কি, বলুন?"

বঙ্কিমবাবু আমার দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আগে তোমার মত কি বল।"

আমি বলিলাম, "আমার ছাপিবার ইচ্ছা নাই।"

"কেন? তুমি কি সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষ? আষাঢ় মাসের 'সাহিত্যে' ত 'সমুদ্র-যাত্রা'র পোষক প্রবন্ধ ছাপিয়াছ?"

"প্রবন্ধ সুলিখিত ও যুক্তিযুক্ত কি না, আমরা তাহাই দেখি। আমাদের মতের বিরুদ্ধ হইলেও আমরা ছাপি।"

"তবে এটা ছাপিবে না কেন?"

"যাহারা সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষ, তাহারা সমুদ্র-যাত্রার পক্ষদিগকে গালি দিতেছে। এ পক্ষ হইতে সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষদিগকে গালি দিয়া সেই দলে ঢুকিয়া কোনও লাভ নাই।"

"গালি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ কি সব সময়ে মন্দ?—অনেক সময়ে বিদ্রূপে অনেক কাজ হয়; জান?"

আমি বলিলাম, "এ লেখাটি কি আপনার ভাল লাগিয়াছে?—ইহার ব্যঙ্গ—"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমার কি মনে হয়?"

আমি বলিলাম, "আমার খুব smart মনে হয় নাই।"

"সবই কি খুব smart হয়?"

আমি বলিলাম, "প্রতিপক্ষকে বাঁদর বলিলে কি রসিকতা হয়? পুরাণো কাসুন্দী ঘাঁটিয়া লাভ কি?"

"পুরাণো কাসুন্দী?"

"আপনার সেই ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের চর্ব্বিতচর্ব্বণ। ইহাতে মৌলিকতা নাই। সাহিত্যের হিসাবেও রচনাটি আমার এমন সার্থক মনে হয় নাই—যে জন্য, গোঁড়াদের যে ব্যবহারের নিন্দা করি, সেই কুকার্য্য নিজেরা করিতে পারি।—তবে আপনি যদি ভাল মনে করেন—"

"না; আমি তোমার সব কথা না শুনিয়া কিছু বলিব না।—বাবু যদি চটেন? তোমার কাগজে তিনি খুব লেখেন, এবং বেশ লেখেন।"

"আমি বুঝাইয়া, মিনতি করিয়া চিঠি লিখিব।—তাতেও যদি চটেন, আমি কি করিব।"

আমি বুঝিলাম, বঙ্কিমবাবু আমার কথা শুনিয়া খুসী হইলেন। পকেট হইতে সেই রস-রচনাটি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—"আমি সম্পাদক হইলে, ইহা ছাপিতাম না। আর ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ—এ সব রচনা খুব original—smart,—to the point না হইলে effective হয় না। এটা শুধু গালাগালিই বটে।"

আমি বাড়ীতে আসিয়া প্রবন্ধটি ফেরত দিলাম। মহিলা-সম্পাদিত একখানি প্রসিদ্ধ মাসিকে পরে তাহা ছাপা হইয়াছিল।

১২৯৯ সালে আমার বিচারশক্তি ঠিক বঙ্কিমবাবুর মত ছিল, এবং আমি খুব বাহাদুর ছিলাম, আশা করি, আমার গুণগ্রাহী জনার্দ্দনদিগকে তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি, এবং তাঁহাদিগকে নাক তুলিয়া আমার শ্রাদ্ধ করিবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছি! আমি কিন্তু কলমটি রাখিবার সময় সেই স্নেহময় মনীষীকে স্মরণ করিয়া ভাবিতেছি,—তাঁহার এত অনুগ্রহ ছিল, এমন আদর্শ মিলিয়াছিল, বিধাতা সব বিফল করিলেন কেন? অথবা, "প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ"—ভবভূতির এই বাণী বিফল হইবার নহে।

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

বংশী-ধ্বনি

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের নীরবতা করি দূর,
অহেতু আনন্দ-রসে ব্রজ-হিয়া করি' পূর
বাজিল মুরলী;
অনন্ত অসীম নভ সে সুরে উঠিছে ভরি',
ক্ষুদ্র তৃণ, ধূলিকণা সে সুর হৃদয়ে ধরি'
পড়িতেছে ঢলি'।
সে সুরে পুলক-ভরে কদম্ব শিহরি' উঠে,
চম্পক অশোক নাগ কানন ভরিয়া ফুটে,
অশথ নিশ্চল;
উল্লসিত গিরি-দরী, নির্ঝর হরষে ঝরে,
বাড়ায় তরঙ্গ-বাহু যমুনা প্রণয়-ভরে
আকুল বিহ্বল।
জড়ের ভিতরে বুঝি সে সুরে চেতনা জাগে,
নবীন জীবন পেয়ে হের সবে অনুরাগে
হ'য়ে তৃষাতুর
বাঁশরীর সুর-সুধা আকণ্ঠ করিছে পান,
আস্বাদ করিছে যেন সে সুরে কাহার প্রাণ
অজ্ঞাত মধুর!
মুরলীর মোহময় মধুময় শুনি' রব
নৃত্য করে রঙ্গ-ভরে ময়ূর ময়ূরী সব
সুখে পুচ্ছ তুলি';
শুক সারি পিক আদি যতেক সুকণ্ঠ পাখী
ডালে বসি' শুনে বাঁশী আনন্দে মুদিয়া আঁখি
নিজ গান ভুলি'।

চকিত বিলোল নেত্র ঊর্দ্ধপানে প্রসারিয়া
আনন্দে কুরঙ্গযূথ সে সুর-অমিয়া পিয়া
থমকি' দাঁড়ায় ;
মধুর বেণুর গানে আকুল ধেনুর প্রাণ,
বৎসগুলি ভুলি গিয়া জননীর স্তনপান
দিশাহারা ধায়।
স্থাবর জঙ্গম যেন লভিতে সঙ্গম কার
অবিদিত ভাব-ভরে খুলিয়া হৃদয়-দ্বার
রহে প্রতীক্ষায় ;
কে যেন আড়ালে বসি' করিতেছে আবাহন,
তার যেন সাড়া পেয়ে অচেতন সচেতন
অভিসারে ধায় !
যমুনা মথিত করি' মরি সে মুরলী-সুর
মোহিত করিল গিয়া গোপ-গোপী-হৃদি-পুর
সুদূর গোকুলে ;
যেমনি শুনিল বাঁশী, উদাসী হইল হিয়া,
অদৃশ্য কুহক যেন সবারে টানিয়া নিয়া
আনে নদী-কূলে।
কান্ত-পদ-সেবা-রতা চরণ ছাড়িয়া ধায়,
অনাদর ভুলি' তার পতি বন-পথে ধায়
সুর অনুসরি' ;
শিশু ফেলি' ধায় নারী, পয়োধরে ক্ষীর ঝরে,
বনিতার বাহু-পাশ বাঁধিতে না পারে নরে,
চলে ত্বরা করি'।
কে যেন কোথায় বসি' ডাকে নিজ গণে তার,
গেহ দেহ ভুলি' তাই নরনারী অনিবার
চলে তার পানে ;

কুল মান ভুলে গোপী, বিহ্বল গোপের প্রাণ,
নাচে সবে নদী-তীরে আনন্দ করিয়া পান
পাগল পরাণে।
বাঁশীর সুরের নেশা সবারে পাগল করে,
যুবক যুবতী কিবা বাল বৃদ্ধ সমস্বরে
করে সংকীর্ত্তন;
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ "কৃষ্ণ কোথা" ডাকে,
কেহ বা যমুনা-বারি প্রেমানন্দে অঙ্গে মাখে
স্মৃতি-নিমগন।
কেহ পিতা কেহ মাতা, কেহ সখা সখী কেহ,
কিঙ্কর কিঙ্করী ভাবে কেহ বা লুটায় দেহ
হ'য়ে আত্ম-হারা;—
কেবল বিরলে এক কিশোরী আছিল ধ্যানে,
বঁধুর বাঁশরী-সুর পশেনি তাহার প্রাণে
ভেদি' দেহ-কারা।
নিগূঢ় মরমে তার যে প্রেম-যমুনা বয়,
না উঠে তরঙ্গ তাহে; শান্ত সুপ্ত সে হৃদয়
অতল, অটল;
বাহ্য উন্মাদনা ওই বাঁশী তথা নাহি বাজে,
বংশীধর নিজে তার দেহাতীত চিত্তমাঝে
মগ্ন অবিরল!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

বাঙ্গালার আদি নাটক

ভদ্রার্জ্জুন।

বাঙ্গালা ভাষার আদি নাটক "ভদ্রার্জ্জুন" মহাভারতের "সুভদ্রা-হরণে"র কাহিনী লইয়া রচিত। সুভদ্রা-হরণের আখ্যানটি বাঙ্গালী কবিগণের বড়ই প্রিয়। তেজস্বিনী সুভদ্রার রথ-সঞ্চালন-কাহিনী তাঁহাদের সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। মাইকেল "সুভদ্রা-হরণ" নামক একখানি কাব্য-রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।* কিন্তু উহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন :—

"তোমার হরণ গীত গাব বঙ্গাসরে
নবতানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা-সুন্দরি!
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে! আশার লহরী
শুকাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে।

* * *

কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবানতর কর, পূজি দ্বৈপায়নে
(ঋষিকুলরত্ন দ্বিজ) গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত; তুমি বিজ্ঞ-জনে,
লভিবে সুযশঃ, সাধ্বি এ সঙ্গীত-ব্রতে।"

মাইকেলের এই অসমাপ্ত ব্রত পরে নবীনচন্দ্র "রৈবতক" কাব্য-প্রণয়ন করিয়া উদ্‌যাপন করেন। মাইকেল 'সুভদ্রা-হরণ' লিখিতে বসিয়া বলিয়াছিলেন—

---

* মাইকেলের অসম্পূর্ণ 'সুভদ্রা হরণ' কাব্যের প্রারম্ভ এইরূপ :—

"কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসীজনে।"

এই বাণী তাঁহার পক্ষে ঘটিল না বটে, কিন্তু ভবিষ্যদ্‌বাণীরূপে সফল হইয়াছিল। কারণ, তাঁহার পর নবীনচন্দ্রই সুভদ্রা-হরণ কাহিনী অবলম্বনে "রৈবতক" রচনা করিয়াছিলেন। এই সুভদ্রা-হরণ কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। বিষবৃক্ষে দেখি—

"এক চিত্রে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিয়াছেন। রথ শূন্যপথে মেঘমধ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাৎ অগণিত যাদবীসেনা ধাবিত হইতেছে, দূরে তাহাদের পতাকাশ্রেণী এবং রজোজনিত মেঘ দেখা যাই-তেছে। সুভদ্রা স্বয়ং সারথি হইয়া রথ চালাইতেছেন। অশ্বেরা মুখামুখি করিয়া, পদক্ষেপে মেঘসকল চূর্ণ করিতেছে। সুভদ্রা আপন সারথ্য-নৈপুণ্যে প্রীত হইয়া মুখ ফিরাইয়া অর্জ্জুনের দিকে বক্রদৃষ্টি করিতেছেন, কুন্দ দন্তে আপন অধর দংশন করিয়া টিপি টিপি হাসিতেছেন, রথবেগজনিত পবনে তাঁহার অলকসকল উড়িতেছে, দুই এক গুচ্ছ কেশ স্বেদবিজড়িত হইয়া কপালে চক্রাকারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।"

[চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার বঙ্কিম কল্পনার তুলিকায় এই সুভদ্রা-হরণের কৌতুক-জনক আধুনিক সংস্করণও অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন,—

"একদিন সুভদ্রার সারথ্য দেখিয়া সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের গাড়ী হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র তখনই একখানি ক্ষুদ্র যানে দুইটি ছোট ছোট বর্ম্মা জুড়িয়া অন্তঃপুরের উদ্যানমধ্যে সূর্য্যমুখীর সারথ্য জন্য আনিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্য্যমুখী বল্গা

"কেমনে ফাল্গুনী শূর স্বগুণে লভিলা
(পরাভবি যদুবৃন্দে) চারু চন্দ্রাননা
ভদ্রায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসীজনে,
বাগ্দেবি! দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।"

ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল দেখিয়া, সূর্য্যমুখী সুভদ্রার মত নগেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া দংশিতাধরে টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। এই অবকাশে অশ্বেরা ফটক নিকটে দেখিয়া একেবারে গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্য্যমুখী লোকলজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া ঘোমটা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া নগেন্দ্র নিজহস্তে বল্‌গা ধারণ করিয়া গাড়ী অন্তঃপুরে ফিরাইয়া আনিলেন এবং উভয়ে অবতরণ করিয়া কত হাসি হাসিলেন। শয্যাগৃহে আসিয়া সূর্য্যমুখী সুভদ্রার চিত্রকে একটি কিল দেখাইয়া বলিলেন, 'তুই সর্ব্বনাশীই ত যত আপদের গোড়া।"

[চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এইরূপ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু অপ্রসিদ্ধ কাব্য ও নাটককার সুভদ্রা-হরণ চিত্রে মুগ্ধ হইয়াছেন। "ভদ্রার্জ্জুন" নামক বাঙ্গালা ভাষার আদি নাটকও এই সুভদ্রা-হরণ বৃত্তান্ত লইয়া রচিত।

"ভদ্রার্জ্জুন" নাটকখানি রচনাগুণে যে সাহিত্যে বিশেষ স্থান লাভ করিবে তাহার সম্ভাবনা না থাকিলেও, আদি নাটক বলিয়া ইহার অপেক্ষাকৃত বিশদ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য এবং ইহার পুনর্মুদ্রাঙ্কনেরও কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বাঙ্গলাভাষার আদি নাটকখানি কিরূপ তাহার বিশদ ধারণা যাহাতে পাঠকমাত্রেই করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার বহুস্থল উদ্ধৃত করাইয়া দেখাইতেছি।

নাটকখানির দৃশ্যে দৃশ্যে ক্রিয়া (Action) কিছুই নাই। কাশীরামদাসের মহাভারত যেরূপ পয়ারাদি ছন্দে রচিত, নাটকের পাত্রপাত্রীও তেমনি পয়ারাদি ছন্দেই কথোপকথন করিতেছে। অতি অল্প স্থলেই গদ্যে কথোপকথন আছে। একখানি কাব্যের পংক্তিগুলি কথোপকথনচ্ছলে লিখিলে যেরূপ হয়, নাটকখানির অধিকাংশ স্থলই সেইরূপ। নাটকোচিত ক্রিয়া বা জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি "ভদ্রার্জ্জুনে" নাই। চরিত্রের মধ্যে বলদেবের অভিমান, ভীমের ক্রোধ

ও নারদের কলহপরায়ণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্রৌপদীচরিত্র আদৌ ফুটে নাই। সত্যভামা ও রুক্মিণী—কৃষ্ণের এই দুই পত্নীর চরিত্র নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উভয় চরিত্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় না। কেবল রমণীগণের কথোপকথন ও ক্রিয়াকলাপ আঁকিতে গিয়া নাট্যকার যেখানে তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গমহিলা-চিত্র আঁকিয়া ফেলিয়াছেন, সেই স্থলগুলি এই হিসাবে দুষ্ট হইলেও বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে।

'ভদ্রার্জ্জুনে'র প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভা। যুধিষ্ঠির রাজসভায় বসিয়া আছেন, "নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।" এই গীতেই নাটকের আরম্ভ। গীতটির প্রথমাংশ এইরূপ,—

[রাগিণী মূলতানী। তাল কাওয়ালী।]
জয় যদুকুল-তিলক দৈত্য-অরে।
হের মতিহীন পামরে মর্ত্ত্য-পরে। ধ্রু।
দুঃখভঞ্জনরূপ তব ভক্তিভরে।
যেবা চিন্তয়ে লভে সেই মুক্তি পরে॥
নহি সখ্যতা-ভাবে পায় ব্যগ্র নরে।
করে শত্রুতা যেই সেই শীঘ্র তরে॥
ইত্যাদি।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে সাবধান করিয়া দিলেন, দ্রৌপদীর জন্য যেন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত না হয়, এবং নিয়ম করিয়া দিলেন, "তোমরা একএকজন দ্রৌপদীসহিত কালক্ষেপণ করিবে এবং একের সময়ে অন্য যিনি দ্রৌপদীর গৃহ প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করিতে হইবেক।" (১০ পৃষ্ঠা) একজন ব্রাহ্মণের গোধন দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অর্জ্জুনকে, দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির যেখানে বিরাজমান ছিলেন, সেই অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে হইল। কাজেই পূর্ব্বোক্ত নিয়মভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি তীর্থযাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে দেখি, সুভদ্রা বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া, দেবকী ও রোহিণী বসুদেবকে পাত্র সন্ধান করিতে বলাতে, বসুদেব বলরামের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। বলরাম দুর্য্যোধনকে উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। দেবকী ও রোহিণী এই কথা শুনিয়া প্রতিবেশিনীর সহিত এই প্রকার যুক্তি করিতেছেন,—

রোহিণী। বরটি নাকি বড় ভাল।

দেবকী। কে বল দেখি ?

রো। রাজা দুর্য্যোধন।

দ। আমি শুনিয়াছি তাহার নাকি বড় দুষ্ট চরিত্র।

রো। বিলক্ষণ, সে কি কথা ? এমন হবে না।**

দে। আবার তার বাপ কাণা।

রো। তার বাপ অন্ধ তাতে ক্ষতি কি ? সে ত কাণা নয় ?

দে। ওমা, সেকি ? একটা কাণা বেয়াই হইবে ? একে দুর্য্যোধনকে সকলে কাণা রাজার বেটা, কাণা রাজার বেটা বলে, আবার সুভদ্রাকে কি কাণার বৌ, কাণার বৌ বলিয়া ডাকিবে ? ওমা, সেটা বড় লজ্জার কথা। **

সহচরী। কেমন গো প্রতিবাসিনী, তুমি ত এই পাড়ার একজন প্রবীণা। অনেক দেখিয়াছ শুনিয়াছ। রোহিণী কি মন্দ বলিতেছে তুমিই বিবেচনা কর দেখি ? ছেলের বাপের যদি কোনও অঙ্গে দোষ থাকে, তাহাতে পাত্র ত সে দোষে দোষী হয় না ?

প্রতিবাসিনী। হাঁ গো বোন্, আমি বিবেচনা করিয়াছি। দেবকী, রোহিণী উহারা ত সেদিনকার মেয়ে, আমি উহাদের বাপের পর্য্যন্ত বিয়া দেখিয়াছি।

[২য় অঙ্ক, ৩য় সংযোগস্থল।]

এই কথোপকথনটি বাঙ্গালী গার্হস্থ্য-চিত্রে বেশ খাপ খাইতে পারে, কিন্তু রাজা দুর্য্যোধনের পত্নীকে 'কাণার বৌ' বলিবে এইরূপ আশঙ্কা ও প্রতিবেশিনীর সহিত পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ প্রাচীন যুগের চিত্র নয়। বাঙ্গলার প্রাচীন লেখকগণ যেমন শিবদুর্গাকেও খাঁটি বাঙ্গালী দম্পতি সাজাইয়া তাঁহাদের কোন্দল বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, 'ভদ্রা-

র্জ্জুন'-রচয়িতা তারাচরণ শিকদারও নাটকখানির সর্ব্বত্রই প্রাচীন-কালের রমণীচরিত্র অঙ্কনে প্রয়াস না করিয়া বাঙ্গালীর মেয়েরই চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ভদ্রার্জ্জুনের রমণীগণের চরিত্র, রীতিনীতি, কথোপ-কথন সবই বাঙ্গালী ধরণের। সেইজন্যই নাট্যকার তবু কতকটা স্বাভাবিকতা বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। নাটকের অন্যান্য চরিত্রের কথোপকথন অধিকাংশই কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথমে, অর্জ্জুন প্রায়শ্চিত্তহেতু তীর্থযাত্রাক্রমে প্রভাসতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছেন। অভ্যর্থনার পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে "রৈবত" (রৈবতক ?) পর্ব্বতে লইয়া চলিলেন। অট্টালিকার উপর হইতে সত্যভামা ও সুভদ্রা অর্জ্জুনের আগমন দেখিতেছিলেন। অর্জ্জুনকে দর্শনমাত্রই সুভদ্রা তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইলেন। পরে সত্যভামা তাঁহার এই অবস্থা জ্ঞাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শের পর নিশীথে সুভদ্রাকে লইয়া অর্জ্জুনের শয়নাগারে উপস্থিত হইলেন ও উভয়ের গান্ধর্ব্ববিবাহ সঙ্ঘ-টন করিয়া দিলেন। এদিকে বলদেব পূর্ব্বেই দুর্য্যোধনকে সুভদ্রার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এখন নারদ গিয়া বল-দেবকে এই গান্ধর্ব্ববিবাহ সংবাদ দিলে বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যো-ধনকে ত্বরায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে নিজ উদ্দেশ্যও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিলেন যে সুভদ্রার সহিত তিনি দুর্য্যোধনের বিবাহ দিবেন। তৃতীয় অঙ্ক এইখানে শেষ হইল।

চতুর্থ অঙ্কে দুর্য্যোধন নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া বরসাজে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন ও যুধিষ্ঠিরের উপদেশে ভীমও সৈন্যসহ বরযাত্রী হইলেন, এই মাত্র বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথমে দুর্য্যোধন আসিতেছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সুভদ্রাহরণে পরামর্শ দিতেছেন। অন্তঃপুরমধ্যে তখন দুর্য্যো-ধনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ হইবে এই বিশ্বাসে রমণীগণের মঙ্গল আচার আরম্ভ হইয়াছে। কৃত্তিবাস যেরূপ সীতার বিবাহোৎসব বর্ণ-

নায় বাঙ্গালীর বিবাহ-আচার বর্ণনা করিয়াছেন, এস্থলে নাট্যকারও সেইরূপ খাঁটি বাঙ্গালীর সংসারের বিবাহ-চিত্রই আঁকিয়াছেন,—

"রুক্মিণী। * * চল সকলে ভদ্রাকে হরিদ্রাদি লেপন করাইয়া স্নানার্থ লইয়া যাই। কোথা গো সহচরি, তোমরা শঙ্খাদি মঙ্গলধ্বনি কর ও হরিদ্রাদি আন।

সহচরী। ঠাকুরাণি, সকল প্রস্তত করিয়াছি, ইহা কি ভুলিবার কথা? প্রতিবাসিনি, তুমি এয়োগণের মধ্যে প্রাচীনা। অগ্রে তুমিই সুভদ্রার গায়ে হরিদ্রা দেও।

প্রতিবাসিনী। আমি হরিদ্রা মাখাইতেছি, তোমরা কেহ শঙ্খরব কর, কেহ বা উলু উলু ধ্বনি দেও। [শঙ্খাদি মঙ্গলধ্বনি হইতে লাগিল।] সত্যভামে, আমাদিগকেই অদ্য নিশায় বাসর জাগিতে হইবেক; দেখা যাইবে দুর্য্যোধন কেমন চতুর ও কত টাকাই বা শয্যা-উঠানি দেয়।

রুক্মিণী। ওগো রজনীর কর্ম্ম রজনীতে হইবে; এক্ষণকার মঙ্গলকর্ম্ম যাহা তাহা শীঘ্র সমাধা কর, এখনও নান্দীমুখাদি অনেক কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে।

সকলে। হাঁ, এখন অন্য কথা রাখ, চল ভদ্রাকে আগে স্নান করাইয়া আনি।

[সকলে নানাবিধ বাদ্যাদি লইয়া উলুধ্বনি করিতে করিতে সরোবরতীরে গমন করিলেন।]"

[৫ম অঙ্ক, ৬ সংযোগস্থল।]

সরোবরতীরে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিলেন। যাদবগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যাদবগণ পরাজিত হইলেন। দুর্য্যোধন বরসাজে উপস্থিত হইয়া এই বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্ষুব্ধচিত্তে প্রস্থান করিলেন। বলরাম নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন—

"কৃষ্ণে সহোদর ভিন্ন, আমি নাহি জানি অন্য
কৃষ্ণের তেমন মন নয়।
চক্রী এক নাম তাঁর, তার চক্র বুঝা ভার
চক্র করি নিজ কার্য্য লয়।...
দিয়া আপনার রথ অর্জ্জুনে দেখায় পথ
হরিবারে মম সহোদরা।

কৃষ্ণের সাহস পায় অর্জ্জুন হরিল তায়
সতত কৃষ্ণের এই ধারা ॥
গৃহমধ্যে শত্রু যার, জীবন তাহার ছার
তার সাক্ষী দেখ দশাননে।
নিজ সহোদর হয়ে রামের শরণ লয়ে
বিভীষণ বধে রক্ষোগণে ॥
তোমাদের প্রিয় হরি আমি সকলের অরি
এই হেতু ডুবালে আমায়।
ভাল ভাল বুঝা গেছে যা হবার হইয়াছে
এবে আর কি আছে উপায় ?......
এখন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহবাসে
লোকালয়ে না রহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ সুখে কর গৃহবাস
সব আশা ঘুচেছে আমার।"

বলরামের এই খেদোক্তির পরই "ভদ্রার্জ্জুন" নাটকের যবনিকা পড়িয়াছে।

বাঙ্গালায় বৈষ্ণবযুগে রচিত সংস্কৃত নাটকগুলির পদ্যে অনুবাদ হইয়াছিল। এমন কি অনভিজ্ঞ লেখক এই সকল পদ্যে অনুবাদিত নাটক দেখিয়া কাব্য * লিখিয়া তাহার নাটক নাম দিয়াছিলেন। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রেম নাটক" ও "রমণী নাটক" ইহার দৃষ্টান্ত। "ভদ্রার্জ্জুন"-প্রণেতা পাশ্চাত্য নাটক পড়িয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার মনে নাটক ও কাব্যের প্রভেদ জ্ঞান বিশেষরূপেই জাগ্রত ছিল। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার নাটকখানির অনেক স্থলে কাব্যো-

---

* "কাব্য" এখানে আধুনিক প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত হইল। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতে কাব্য দুই প্রকার, দৃশ্য ও শ্রব্য। দৃশ্য কাব্যই নাটক। এখন বাঙ্গালায় কাব্য বলিতে সাধারণতঃ শ্রব্য গীতিকাব্যই বুঝাইয়া থাকে। এই অর্থেই এখানে আমরা "কাব্য" শব্দ প্রয়োগ করিলাম।

চিত ভাষার অবতারণা হইতে বিরত থাকিতে পারেন নাই। কাব্যে বিস্তৃত উপমা উৎপ্রেক্ষাবহুল অতিশয়োক্তিপূর্ণ অনুপ্রাস বা যমকযুক্ত রচনা শোভা পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু নাটকে এরূপ রচনা আদৌ প্রয়োগার্হ নহে। কিন্তু কাব্যরস বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জার সহিত এরূপ বিজড়িত যে বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যে তাহা স্থানে অস্থানে প্রযুক্ত হইতে থাকে। কেবল 'ভদ্রার্জ্জুন'-প্রণেতা কেন, মাইকেল, দীনবন্ধু, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মনোমোহন বসু প্রভৃতি সকল নাট্যকারই অল্পাধিক পরিমাণে এ বিষয়ে দোষী। গেটের ফাউষ্ট্, বাইরণের ম্যান্‌ফ্রেড্ বা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যাংশে সুমোহন হইলেও এগুলি অভিনয়োচিত নাটকের মধ্যে উচ্চস্থান দাবী করিতে চাহে না। 'ভদ্রার্জ্জুনে' ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালী কবির অনুকরণে যেখানে যেখানে নাট্যকার কাব্যরস-সিঞ্চনে নাটকের সৌষ্ঠব বিধান করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, সেইখানটিই কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। সুভদ্রা নিম্নলিখিতরূপে অর্জ্জুনের রূপ বর্ণনা করিতেছে,—

"বদনমণ্ডল মাঝে অক্ষিরূপ তূণ।
লুকাইয়া পুষ্পশর রেখেছে অর্জ্জুন॥
ধনুকের গুণ খুলি রেখেছে মনেতে।
ধনুঃ মাত্র থুইয়াছে কপাল নিয়েতে॥
প্রণয়কাননে পার্থ থাকে লুকাইয়া।
মৃগী অন্বেষণ করে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া॥
কুরঙ্গিনী কামিনীর পাইলে সন্ধান।
কটাক্ষে টানিয়া ধনুঃ করয়ে সন্ধান॥

*   *   *   *

মনের অনলে সখি, প্রাণ মোর দহে।
ভস্মসাৎ হই বুঝি আর নাহি সহে॥
জ্বলিছে প্রবলতর বাণের আগুন।
জলধররূপ হেরি সম্মুখে অর্জ্জুন।

হতাশা পবন তায় হয়ে সহকারী।
ঘন হতে নাহি বর্ষাইতে দেয় বারি॥
অনলে অনিলে প্রেম অতি ঘোরতর।
উভয়ের সংযোগে উভয়ে বীরবর॥
এখনো অর্জ্জুন যদি বরিষে সলিল।
তবে থামাইতে পারে অনল অনিল॥"

[৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ সংযোগস্থল।]

আবার আর একস্থানে সুভদ্রা পাঁচালীর ছড়ার ন্যায় শ্লেষালঙ্কার-যুক্ত বিলাপ করিতেছে—

"কালকূট দেও সখি করি আমি পান।
নিশাকর সহিত প্রাণ হউক অবসান॥
কাল সম কাল রাত্রি মম পক্ষে কাল।
চাহি কাল নাহি ইচ্ছা দেখিতে সকাল॥
জ্ঞানে নাহি পাপ ক্রিয়া করি কোনও কাল।
দাদা বলদেব কেন হইলেন কাল।"

এইরূপ কৃত্রিমতাপূর্ণ রচনার পরাকাষ্ঠা অন্ত্যযমকবহুল নিম্নোদ্ধৃত অর্জ্জুনের রূপবর্ণনায় সুপ্রকট,—

"অর্জ্জুনের মুখ-সুধাকর সুধাকর।
যেই সুধাপানে হইল অমর অমর॥
সেই সুধা মম প্রাণী যদি পান পান।
তা নহিলে কভু নাহি পাবে প্রাণ প্রাণ॥
তাহার হৃদয় জলাশয় জলাশয়।
এ হৃদি-মরাল-পক্ষে সেই পয় পয়॥
মম হৃদেশয় তার যদি পাই পাই।
এ নয়ন উন্মীলনে তবে চাই চাই॥
নহিলে না থাকে স্নিগ্ধ জলন জলন।
কেমনে করিবে গৃহে চরণ চরণ॥"

[৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ সংযোগস্থল।]

আবার ইহার উপর অপ্রচলিত দুরূহ উৎকট শব্দ-বিন্যাসে নাট্যকার নাটকখানির শোভাসম্পাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, যথা—

"মন-কুঞ্জর মম নাহি ধৈর্য্য ধরে।
পাপ-খঞ্জরাঘাত কত সহ্য করে॥
ভূতে নিস্তার করণাশে পঙ্ককূপে।
ভূতা জঞ্জাল ক্ষিতিতলে বঙ্করূপে॥"

[১ম অঙ্ক, ১ম সংযোগস্থল।]

আর অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, নাটকের মধ্যে স্থানে অস্থানে কাব্যরস অবতারণার চেষ্টা করাতে 'ভদ্রার্জ্জুন' কিরূপ নীরস, বিরক্তিজনক ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। দীনবন্ধুর নাটকাবলীর মধ্যে কাব্যরস-যুক্ত দীর্ঘ কবিতাগুলিও অভিনয়ের সময় বিশেষ বিরক্তিজনক মনে হইয়া থাকে। কাব্যরচয়িতা যে পথে চলেন, নাট্যকারের সে পথ নহে। ভারতচন্দ্র অনুপ্রাস যমক প্রয়োগ করিয়া উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি দিয়া শত পংক্তিতে বিস্তার রূপবর্ণনা করিতে পারেন, কিন্তু নাট্যকার পাত্রপাত্রীর মুখে এতাদৃশ বর্ণনা দিলে নিঃসন্দেহ হাস্যাস্পদ হইবেন। সংস্কৃত নাটকাদিতে কেবল কাব্যাংশবহুল এক একটি সমগ্র অঙ্ক † দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলি অভিনয়কাল অপেক্ষা পাঠকালেই সমধিক প্রীতিদায়ক। রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে নিজ নাটকাবলীর স্থানে স্থানে এ দোষ সংক্রামিত করিয়াছেন। তাঁহার পথে পরে দীনবন্ধুও অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের আলোচ্য 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকখানিতেও পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গলা কাব্যের কৃত্রিমতাপূর্ণ রচনার প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

"ভদ্রার্জ্জুনে"র প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পদ্যে রচিত। পয়ার ও

† উত্তররামচরিত, দ্বিতীয় অঙ্ক। বিক্রমোর্ব্বশী, চতুর্থ অঙ্ক ইত্যাদি।

ত্রিপদী ছন্দই নাটকখানিতে সমধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। কথোপকথন পদ্যেই চলিতেছে। যথা—

অর্জ্জুন। কে তুমি এখানে কর আক্ষেপ প্রকাশ?
ব্রাহ্মণ। দেখ হে অর্জ্জুন মম হয় সর্ব্বনাশ॥**
অ। বিশেষ করিয়া তার কহ বিবরণ।
ব্রা। ধর্ম্মরাজ্যে অরাজক হয় কি কারণ॥
অ। কেন প্রভো কি ঘটনা হইয়াছে কও।
ব্রা। আমার গোধনগণ আনাইয়া দাও॥

[১ম অঙ্ক, ২য় সংযোগস্থল।]

হাস্যরস সৃষ্টির জন্য নাট্যকার একটি মৌলিক দৃশ্য সংযোজিত করিয়াছেন। তাঁহার হাস্যরসের নমুনা এইরূপ,—

"[এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী ও কতিপয় পথিক প্রবেশ করিল। মদ্যপায়ী গান করিতেছে।—

* * * * *

বা। বেটা তুই কি গান করিতেছিস্?
ম। ওরে শ্যালা, মায় নাম গাইতেছি।
বা। তুই শ্যালা, মদ খাইয়াছিস্? উঁ, শ্যালার মুখে গন্ধ দেখ।**
ম। (গীত) ঐ আস্‌তেছে অর্জ্জুন।
আমি মদের জন্য হব খুন।
যখন অর্জ্জুন আসবে কাছে তার কাছে ভিক্ষা চাব।
সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে তাই দিয়ে মদ কিনে খাব। **

ম। ও ভাইসকল, ঐ দেখ কৃষ্ণের রথ আসিতেছে। আমাদের এক কৃষ্ণ ছিলেন, আবার দুইটা হইয়াছেন। একি! তবে অর্জ্জুন কোথায়? ** হয় ত অর্জ্জুন পলাইয়াছে।

বা। হাঁ, তোর ভয়ে।**

তৃতীয় পথিক। ওহে, অর্জ্জুন ত কেহই নয়, একজন কৃষ্ণ ও অন্যজন উদ্ধব। **

চতুর্থ পথিক। কেন উদ্ধব উদ্ধব করিতেছ, উদ্ধবকে কোথায় পাইলে ? উদ্ধব, উদ্ধব, একটা কি কথা পাইয়াছ, উদ্ধব কাহাকে দেখিলে ?

অন্যান্য পথিক। অর্জ্জুনই বটে। হাঁ, তিনিই বটে। কোথা উদ্ধব, যে বলে সে গর্দ্দভ।"

[৩য় অঙ্ক, ৫ম সংযোগস্থল।]

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে নাট্যকারের হাস্যরস-সৃষ্টি-প্রয়াস বিশেষ সফল হয় নাই। তবে প্রথম যে সকল বাঙ্গলা নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহার রচয়িতাগণ প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থকারের ন্যায় অশ্লীলতার অবতারণা করিয়া নাটকে হাস্যরস আনিতেন। 'ভদ্রার্জ্জুন'-প্রণেতা যে তাহা করেন নাই, এইমাত্র প্রশংসা তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন।

"ভদ্রার্জ্জুনে" এক বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একটি দৃশ্যের শেষে কতকগুলি পংক্তিতে অনেক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। যথা, প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের পর লেখা আছে—

"এইরূপ বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুন গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ লইয়া তস্করদিগকে ধৃত করিলেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুনকে আশীরাশি প্রদানকরত স্বগৃহে গমন করিলেন।"

[১৫ পৃষ্ঠা]

মুদ্রিত নাটক পাঠের সময় না হয় আমরা ব্যাপারটা বুঝিলাম, কিন্তু অভিনয়ের সময় দর্শক ইহা বুঝিবে কিরূপে ? হয় ইহা উহ্য থাকিবে, না হয় নাট্যকারকে কোনও স্বগতোক্তি বা অন্য পাত্রের উক্তি দ্বারা ইহা বুঝাইতে হইবে।

"ভদ্রার্জ্জুন" বাঙ্গালার আদি নাটক হইলেও ইহার কোথাও অভিনয় হয় নাই। সেইজন্য সাধারণের নিকট ইহা তত প্রতিপত্তি বা প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। ইহার একমাত্র বিশেষত্ব এই যে, ইহা ইংরাজী নাটকের গঠন-রীতির আদর্শে রচিত, সংস্কৃত নাটক-রচনা-পদ্ধতির আদৌ অনুসরণ করে নাই। বাঙ্গলা নাটকের বাহ্য-গঠনে

ইংরাজী আদর্শই এখন স্থায়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু 'ভদ্রার্জ্জুনে'র প্রভাবে তাহা হয় নাই। মাইকেল ও দীনবন্ধুর নাটকাবলীর প্রভাবেই তাহা হইয়াছে। তবে ইংরাজী নাটকের গঠন-রীতির অনুকরণ-প্রয়াস 'ভদ্রার্জ্জুনে'ই প্রথম হইয়াছিল। কেবল ইহার অভিনয় না হওয়ায় এ নাটকখানি জনসাধারণের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

"ভদ্রার্জ্জুনে"র সমসাময়িক দুইখানি নাটকের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ ইহাদের একখানিকে 'ভদ্রার্জ্জুনে'রও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে চাহেন। * যতদিন না উক্তগ্রন্থ কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে ততদিন নিশ্চয় করিয়া ইহা স্বীকার করা যায় না। তবে অন্যান্যস্থল হইতে এইমাত্র জানা যায় যে হরচন্দ্র ঘোষ এই নাটক দু'খানির প্রণেতা। ইনি হুগলীনিবাসী ছিলেন। ইংরাজী হইতে বাঙ্গলায় গ্রন্থাদি অনুবাদে ইঁহার পটুতা ছিল। হুগলীকলেজে পাঠ্যাবস্থায় ইঁনি Baconএর Essay on Truthএর বঙ্গানুবাদ করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাঁহার নাটক দু'খানিও অনুবাদ মাত্র। প্রথম "ভানুমতী-চিত্তবিলাস" Merchant of Veniceএর অনুবাদ ও দ্বিতীয় "চারুমুখ-চিত্তহরা" Romeo Julietএর অনুবাদ। এই বাঙ্গলা নাটক দু'খানির ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই সেক্ষপীয়রের ন্যায়। পাত্রপাত্রীর নামগুলি কেবল বাঙ্গলা। সুতরাং বাঙ্গলা মৌলিক নাটক বলিতে গেলে "ভদ্রার্জ্জুন"ই আদি নাটক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

---

* ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান্ ডেলি নিউস্ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় বাঙ্গলা ভাষার প্রথম নাটককার কে?" এই প্রশ্নের আলোচনা হয়। কে, বি, দত্ত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, One who knows প্রভৃতি মহোদয়গণ পত্রদ্বারা এই প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা পান। শেষোক্ত অজ্ঞাতনামা পত্রপ্রেরক হরচন্দ্র ঘোষের "ভানুমতী-চিত্তবিলাস"কে "ভদ্রার্জ্জুনে"র পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন। আমরা এই নাটকখানির অনুসন্ধান করিতে সকলকে অনুরোধ করি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[৪]

তত্ত্ব ও কল্পনা

পৌরাণিকী কল্পনার শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্ববস্তু যে কৃষ্ণবস্তু তাহা হইতে পৃথক্‌ করিতে গেলে, লোকের গতানুগতিক ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে, ইহা জানি। এই দুই যে ফলতঃ একই বস্তু, ইহাদেরে যে একান্তভাবে পৃথক্‌ করিতে পারা যায় না, ইহাও মানি। কিন্তু লোকে তত্ত্বের খোঁজ রাখে না বলিয়াই যে পৌরাণিকী কল্পনার নিগূঢ় মর্ম্মও বুঝে না, এই কথাই বা অস্বীকার করিতে পারি কি? শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণলোকে একজন দেবতা মাত্র মনে করিয়া থাকে। আর দেবতাতে ব্রহ্মজ্ঞান এদেশে নূতন নহে। প্রাচীনকাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবোপাসকেরা আপন আপন সাম্প্রদায়িক উপাস্যবস্তুকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবতাও এইরূপে ব্রহ্মপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"—ঋগ্বেদের এই সর্ব্বজনবিদিত শ্রুতি ইহার প্রমাণ। পৌরাণিক ধর্ম্মেও বিষ্ণু এবং মহেশ্বর উভয়ই ব্রহ্মরূপে উপাসিত হইয়াছেন। তন্ত্রের কালী দুর্গা প্রভৃতি সকলেই সাধারণ তান্ত্রিকদিগের দ্বারা "ব্রহ্মময়ী"রূপে আরাধিত হইয়া আসিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধকেরা কালী এবং কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত মিলাইয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ স্বয়ং ইহার সাক্ষী। "গোপনে, গোকুলে এসে, শ্যাম সেজেছ, শ্যামা!" "একবার নাচ গো শ্যামা, যশোদা নাচাত তোমায়, বলে নীলমণি, সে বেশ লুকালে কোথায়, করালবদনী";—এইসকল সংগীত ইহার প্রমাণ। এইসকল ক্ষেত্রে আন্তরিক অনুভূতি যতই গভীর এবং ভাবোচ্ছ্বাস যতই আকুল হউক না কেন, তত্ত্বের উপলব্ধি যে ততটা পরিষ্কার নহে, একথা অস্বীকার করা

অসম্ভব। বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব বলিয়াছেন। ইনি ঋষিকেশ। ইনি নারায়ণ। ইনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, বৃন্দাবনচন্দ্র। দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া বৃন্দাবনে লীলা, মথুরায় অসুরনাশ, দ্বারকায় রাজত্ব, কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন; পুরাণের সকল কথাই বৈষ্ণবেরা সমভাবে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু অতি অল্প লোকেই পূর্ব্বাপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া, তত্ত্বের সঙ্গে পুরাণের সম্যক সমন্বয় সাধন করিয়া, এই বিরাট ও জটিল কৃষ্ণকথার নিগূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন। প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যথাসাধ্য বিচারপূর্ব্বক এসকলের একটা অর্থবোধের চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক বৈষ্ণবেরা কোনও বিচারই করেন না। "বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর"—এই সত্য উপদেশের একটা কল্পিত কদর্থ করিয়া, "পহুঁ তুহিঁসে কেবলে"র-স্থানে "বপু ভূতিসে কেবল" পড়িয়া, চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া, তৃপ্তিলাভ করেন। কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান ইহাঁরা রাখেন না। কৃষ্ণজিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত ইহাঁদের জাগে নাই। আর তত্ত্বভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন না বলিয়া, বহুতর নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের কৃষ্ণোপাসনাও কেবল কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াকলাপে এবং বস্তুতন্ত্রতাবিহীন ভাবের উচ্ছ্বাসেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ইহাঁরা নাম শুনিয়াছেন, বস্তু চিনেন নাই, চিনিবার আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়াছে কি না, সন্দেহ। ইহাঁরা অনুবাদকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, যার অনুবাদ তার খবর জানেন না ও রাখেন না। কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু সত্য দেখেন নাই। আর কৃষ্ণবস্তু যে সত্যবস্তু ও তত্ত্ববস্তু, এই কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্যই, তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া একটা নূতন কথার সৃষ্টি করিয়া, এই শ্রীকৃষ্ণকে পৌরাণিকী কল্পনার শ্রীকৃষ্ণ হইতে এতটা জোর করিয়া টানিয়া পৃথক্ করিতে হয়। নতুবা, প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণতত্ত্বকে কৃষ্ণকথা হইতে পৃথক্ করা যায় না। শুক্ল বা কৃষ্ণ বস্তু হইতে যেমন শুক্লত্ব বা কৃষ্ণত্ব ধর্ম্মকে, চিন্তায় পৃথক্ করিলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে পৃথক্ করা যায় না; সেইরূপই কৃষ্ণতত্ত্বকে কৃষ্ণকথা হইতে পৃথক্ করা সাধ্যায়ত্ত নহে।

শুক্লবস্তু ও শুক্লত্ব, কৃষ্ণবস্তু ও কৃষ্ণত্ব, তিক্তবস্তু ও তিক্তত্ব, সাধু ব্যক্তি ও সাধুতা, ধার্ম্মিক ও ধর্ম্ম, ভক্ত ও ভক্তি, এ সকল যেমন অভিন্ন; কৃষ্ণকাহিনী এবং কৃষ্ণতত্ত্বও সেইরূপই অভিন্ন। ধর্ম্ম ভিন্ন ধার্ম্মিক অসৎ। ভক্তি ভিন্ন ভক্ত অলীক কল্পনা মাত্র। আবার ধার্ম্মিক এবং ভক্ত ভিন্ন ধর্ম্ম এবং ভক্তিও নিরাকার ভাব মাত্র, সত্য বস্তু নহে। ধর্ম্মের ও ভক্তির বাস্তবতা ধার্ম্মিকে ও ভক্তে। ধার্ম্মিকের ও ভক্তের সত্তা ও প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মেতে ও ভক্তিতে। সেইরূপ তত্ত্ব ভিন্ন পুরাণ অবস্তু, মিথ্যা। পুরাণ ভিন্ন তত্ত্ব অব্যক্ত, অজ্ঞাত। কৃষ্ণতত্ত্বের আশ্রয়েই পুরাণের অপূর্ব্ব কৃষ্ণকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার এই কাহিনীর মধ্যেই ঐ তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পুরাণকথাকে অবলম্বন করিয়াই, যুগযুগান্ত ধরিয়া, আমাদের দেশের সুকৃতিসম্পন্ন সাধকেরা, নিজেদের অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতিতে এই কৃষ্ণবস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ভাব ও ভাষার পরস্পরের সঙ্গে যে নিগূঢ়, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, কৃষ্ণতত্ত্বের সঙ্গেও পুরাণের কৃষ্ণকাহিনীর সেই সম্বন্ধ। কৃষ্ণতত্ত্ব অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য, ভাব-স্বরূপ। সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুই পুরাণের কৃষ্ণকথার মধ্য দিয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক অপূর্ব্ব রসমূর্ত্তিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাব অগ্রজ, ভাষা তার অনুজ। কোনও কোনও পণ্ডিতগণ বলেন যে ভাব ও ভাষা একে অন্যের অগ্রজ বা অনুজ নহে, দু'ই যমজ; যুগপৎ উভয়ের উদ্ভব হয়। মানুষের চিন্তার প্রণালীতেই কেবল ভাবকে ভাষার অগ্রজ বলা হয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে ভাষাকে মুখে করিয়াই ভাব প্রকাশিত হয়। কিন্তু আদিতে ভাব যদিও বা ভাষার পূর্ব্বজ হয়; তথাপি এই ভাষার দ্বারাই পরে ঐ ভাবের ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। ভাষা যত ফোটে, ভাব তত বাড়ে। ভাব যত ফোটে, ভাষাও তত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু ভাষা যতই পরিস্ফুট হউক না কেন, ভাব সর্ব্বদাই তাহাকে ছাড়াইয়া থাকে; কিন্তু কখনও ছাড়িয়া যায় না।

ভাব নিরাকার, ভাষা তাহাকে আকারিত করে। ভাব মূক, ভাষা তাহাকে মুখর করে। ভাব ধোঁয়া, ভাষার সুনিপুণ ফুৎকারেই তাহা জ্বলিতজ্বলনরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে। ভাব বিশ্ববীজ স্ফোট-স্বরূপ। ভাষা সেই স্ফোটেরই পরিণতি, এই প্রত্যক্ষ রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় সৃষ্টি। ভাব ও ভাষার মধ্যে এই যে নিগূঢ়, নিত্য, ব্যক্তাব্যক্ত, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দেখিতে পাই, তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পৌরাণিকী কল্পনার শ্রীকৃষ্ণেরও সেই সম্বন্ধ। পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ কল্পিত বটেন, কিন্তু অসত্য নহেন।

ফলতঃ কল্পনা সর্ব্বথাই যে মিথ্যা হয়, এই কথাই বা কে বলিল? অলীক কল্পনা আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সত্য কল্পনা যে নাই, ইহাই বা বলি কেমনে? আমাদের ভাষাতে অলীক কল্পনার একটা বিশিষ্ট নাম নাই। কেহ কেহ ইহাকে কাল্পনিকতা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অলীকতা অপেক্ষা কৃত্রিমতার ভাবই বেশী প্রকাশ পায় এবং এইজন্যই এই কথারও তেমন ব্যবহার হয় নাই। কিন্তু ইংরাজিতে ইহার একটা বিশিষ্ট নাম আছে। ইংরাজিতে অলীক কল্পনাকে ফ্যান্সি কহে। সত্য-কল্পনারও একটা নাম সে ভাষায় আছে, তাহাকে ইমেজিনেষণ বলে। ফ্যান্সি এবং ইমেজিনেষণ দু'ই আমরা কল্পনা বলিয়া থাকি; কিন্তু ইংরাজি ফ্যান্সি আর ইমেজিনেষণ এক বস্তু নহে। আর কল্পনার আশ্রয়ে যে কেবল কাব্যসৃষ্টিই হয়, তাহাও ত নয়। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, তত্ত্ববিদ্যা, মানবজীবনের কোনও শ্রেষ্ঠ সাধনা বা সম্ভোগই কল্পনার আশ্রয় ব্যতীত সম্ভব হয় না। প্রত্যক্ষবাদীগণ যতই বাস্তবতার বড়াই করুন না কেন, তাঁহাদের এই তথাকথিত প্রত্যক্ষবাদ পর্য্যন্ত কল্পনার সাহায্য ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হয় না। জড়বিজ্ঞান যে বিশ্বব্যাপী বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া, বিশেশ্বরকে পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে চাহে, সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা তথ্যও কল্পনারই উপরে প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যক্ষের উপরে নহে। আধুনিক কেমিস্তি যে পরমাণুবাদের বা অ্যাটমিক থিওরীর উপরে সমগ্র রসায়ন

তত্ত্বটাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই পরমাণু কেহ কি কখনও দেখিয়াছে, না মাপিয়াছে, না কোনও উপায়ে তার কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছে? এই পরমাণুবাদও ত কল্পিত, প্রত্যক্ষ নহে। যে মাধ্যাকর্ষণী শক্তির দ্বারা অসংখ্য সৌরজগৎ আপনাপন সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি লইয়া এই মহাশূন্যে ঝুলিতেছে ও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্টপথে চলিতেছে, তাহা কি প্রত্যক্ষ, না কল্পিত? বৃন্তচ্যুত ফল মাটিতে পড়িয়া যায়, আকাশে ঝুলিয়া থাকে না; এটা একটা অদ্ভুত বা অদৃষ্টপূর্ণ ঘটনা নহে। কিন্তু এই ঘটনা দেখিয়া নিউটন যে বিশ্বব্যাপী মাধ্যাকর্ষণী শক্তির প্রচার করিলেন, তাহা কোনও দিন কেউ চক্ষে দেখে নাই, হাতে ধরে নাই, কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করে নাই। এই যে মাধ্যাকর্ষণের বিধান আবিষ্কৃত হইল, ইহা কি প্রত্যক্ষের, না কল্পনার ফল? বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ করেন বিশিষ্ট ঘটনা বা কার্য্য, কিন্তু কল্পনা করেন তাহার অন্তরালে বিশাল, বিশ্বজনীন কারণের বা নিয়মের বা শক্তির খেলা। বিজ্ঞান যত কেন প্রত্যক্ষের দোহাই দিক না, কল্পনাকে ছাড়িয়া সে এক চুলও আপনার সাধনপথে চলিতে পারে না। গণিতবিদ্যাকে ত সকলেই নিতান্ত প্রত্যক্ষ ও প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু গণিত পর্য্যন্ত এই সত্য কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া আছে। দেশ এবং কালের উপরেই গণিতের প্রতিষ্ঠা। অনন্ত বিস্তৃত দেশ, যে দেশ আবার অনন্তভাগে বিভক্ত হইতে পারে; অনন্ত প্রবাহিত কাল, যে কাল আবার অনন্তভাগে বিভক্ত হইতে পারে;—এই দুইটি বস্তুকে লইয়াই ত গণিতের যত কারচুপি। কিন্তু এই অনন্ত-বিস্তার ও অনন্ত-প্রবাহ, অথচ অনন্ত বিভাগক্ষম দেশ ও কাল কে কোথায়, কিরূপে, কোন্ দিন, প্রত্যক্ষ করিয়াছে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশখণ্ডই আমরা জানি। ছোট ছোট কাল-কলাই আমরা বুঝি। এদের সীমা দিতে পারি না। সীমা দিতে যাইয়াই দেখি, পূর্ব্বে ও পরে আরও দেশ এবং আরও কাল থাকিয়া যায়। এই পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ গোচর হয়। কিন্তু যার

লাগাইল পাই নাই, তাহাই যে অনন্ত, কোনও দিন তার অন্ত পাইব না, এ কথা বলি কার জোরে? এ ত কল্পনা। যাহা প্রত্যক্ষ করি, তারই ইঙ্গিত লইয়া এই সকল কল্পনার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়, এই কথা সত্য। ইহা কল্পনা বটে, কিন্তু এই কল্পনা বস্তু-তন্ত্র, প্রত্যক্ষের উপরে, প্রত্যক্ষকে পূর্ণ ও সার্থক করিয়াই, গড়িয়া উঠিয়াছে, এই কথা বলিতে পার। আর তারই জন্য বিজ্ঞানের এ সকল কল্পনা সত্য, এই দাবি করাও সম্ভব। এই কল্পনাকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আস্তিক নাস্তিক সকল প্রমাণশাস্ত্রেই অনুমান ও উপমানকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আর অনুমানের রাজ্যে যাইতে হইলেই, কল্পনার রথে চড়িতে হয়। এই কল্পনাকে ছাড়িয়া কেবল যে কাব্যসৃষ্টিই অসম্ভব হয়, তাহা নহে। ইহাকে ছাড়িয়া মানুষের মন কিছুই মনন করিতে পারে না; মানুষের জ্ঞান কিছুই জানিতে পারে না; মানুষের চেষ্টা পঙ্গু হইয়া পড়িয়া রহে; মানুষ এই সকল সুখসাধক ন্দ্রিয়গ্রাম লইয়া, এই আনন্দময় বিশ্বে, কণা-মাত্র আনন্দভোগ করিতে পারে না। কল্পনা মাত্রকেই যদি অসত্য বলিয়া পরিহার করিতে হয়, তাহা হইলে কেবল কৃষ্ণগাথা নহে, কিন্তু—

'সীমার মধ্যে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর'

এসকল নিরাকার সংগীতকেও কল্পিত বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে। নানকের যে অমন গুরুগম্ভীর ভজন,

"গগনমে থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে",

তাহাকেও মিথ্যা বলিয়া ছাড়িতে হয়। তাহা হইলে ঈশ্বর, পরলোক, ধর্ম্মের সকল বাঁধন, ভক্তির সকল সাধন, জীবনের সকল প্রতিষ্ঠাই উড়িয়া যায়। অথচ এই সকলকে উড়াইয়া দিয়াও, কল্পনাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পুরাতন লোকায়ত ও আধুনিক জড়বাদী নাস্তি-কেরা এসকলের কিছুই ত একরূপ মানেন নাই, অথচ এই প্রত্যক্ষ সংসার-ভোগের জন্যই ইহাঁদিগকেও পদে পদে কল্পনার পদসেবা

করিতে হয়। ফলতঃ কল্পিত আর মিথ্যা একই কথা নহে। মিথ্যা কল্পনা বিস্তর আছে। কিন্তু সত্য কল্পনাও আছে। মানুষের প্রত্যক্ষ ও প্রামাণ্য অভিজ্ঞতাকে ধরিয়া, সেই অভিজ্ঞতার মর্ম্ম উদ্ঘাটন বা অর্থ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, যে কল্পনা ফুটিয়া উঠে, তাহাই সত্য কল্পনা। ইহাকেই ইংরাজিতে ইমেজিনেষণ কহে। এই কল্পনা সত্য বলিয়াই, বিজ্ঞানের রাজ্যে ইহাকে সায়ান্টিফিক্ ইমেজিনেষণ—scientific imagination—বা বৈজ্ঞানিক কল্পনা; ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে, হিষ্টরিক্ ইমেজিনেষণ—historic imagination—বা ঐতিহাসিক কল্পনা; ধর্ম্মজীবনে রিলিজিয়াস্ ইমেজিনেষণ—religious imagination—বা ধর্ম্ম-কল্পনা; এবং কাব্য-সৃষ্টিতে পোয়েটিক ইমেজিনেষণ—poetic imagination—বা কবিকল্পনা বলিয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে ফ্যান্সি—fancy—শব্দ ব্যবহৃত হয় না। কারণ এইসকল কল্পনা হইলেও মিথ্যা নহে। এ কল্পনা প্রত্যক্ষেরই মতন, এমন কি এক হিসাবে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা বেশী সত্য। প্রত্যক্ষ যাহার ইঙ্গিত মাত্র করে, আপনার সত্য প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠারূপে যে বস্তুর সঙ্কেত মাত্র প্রত্যক্ষ বহন করিয়া আনে, কিন্তু যাহাকে প্রত্যক্ষের দ্বারা কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, এই কল্পনা, সেই সঙ্কেত ধরিয়া, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষেরই ভিতরে যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সত্য বা তত্ত্ব লুকাইয়া আছে, তাহাকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করে। এই জন্য এই কল্পনা যে বস্তুকে প্রকাশ করে, তাহা অতীন্দ্রিয় মাত্র, অসত্য নহে। অতএব পৌরাণিকী কৃষ্ণ-কাহিনী কল্পিত বলিয়া যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, এমন বলা যায় না। সত্য কল্পনাতেও সত্যাভাস মিশিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক কল্পনা—সায়েন্টিফিক্ ইমেজিনেষণ—এবং ঐতিহাসিক কল্পনা বা হিষ্টরিক্ ইমেজিনেষণেও থাকে; সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ়তম যে ধর্ম্মরাজ্য, সে রাজ্যের সত্য-কল্পনায় অর্থাৎ রিলিজিয়াস্ ইমেজিনেষণেতে যে বহুতর সত্যাভাস থাকিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। পৌরাণিকী কল্পনার কৃষ্ণকাহিনীতে যে সত্যাভাস নাই, এমন কথা কে বলিবে? আর এই কল্পনার কতটাই

বা সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র, আর কতটাই বা অলীক ও বস্তুতন্ত্রতা-বিহীন এবং সত্যাভাস মাত্র, কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনার দ্বারাই কেবল তাহা ধরিতে পারা যাইবে। ইহার আর কোনও কষ্টিপাথর নাই। আর এই কারণেই, তত্ত্ববস্তুকে দৃঢ় করিয়া ধরিবার জন্যই, তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণকে এই বিচারের সূচনায়, ব্যতিরেকী পন্থার অনুসরণ করিয়া, পুরাণ-কল্পনার শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিতে হয়। পরিণামে অন্বয়মুখে, পৌরাণিকী কথার যতটা তত্ত্বের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে ও তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহা আপনি নিজের তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়া সত্য-বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যা

নারায়ণ

১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা] [বৈশাখ, ১৩২২ সাল

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়

বঙ্কিমবাবুর বাড়ী আমার বাড়ী হইতে বেশী দূর নয়। নৈহাটি ষ্টেসন হ'তে তাঁর বাটী যতটুকু দক্ষিণ, আমার বাড়ী প্রায় ততটুকু উত্তর-পশ্চিম। তাঁদের বাড়ীতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে, খুব জাঁকাল নিত্য-ভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে। শুনিয়াছি মুড়াগাছা পরগণায় রাধাবল্লভের খুব বড় একটা তালুক আছে। তারই মুনাফা হ'তে তাঁহার সেবা চলে। দুইঘর চাটুয্যে মহাশয়রা রাধাবল্লভের সেবাইত, একঘর ফুলে, আর একঘর বল্লভী। বঙ্কিমবাবুরা ফুলে। চাটুয্যে মহাশয়দের সেবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কেবল উহাদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা তত ভাল নয়, ভোগের এক অংশ তাঁহাদের বাড়ীতে যায়। অনেক গরীব দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়। রাধাবল্লভের বারমাসে তের পার্ব্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়। রথখানি পিতলের, বেশ বড়। বারমাস রথখানি গোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘষে মেজে চক্‌চকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ীর দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটি মেলা হয়; প্রচুর পাকা কাঁটাল ও পাকা আনা-

রস বিক্রী হয়, তেলেভাজা পাঁপোর ও ফুলুরির গাঁদি লাগিয়া যায়, আট দশ খানা বড় বড় ময়রার দোকান বসে, গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা, মুড়িমুড় কি, মটরভাজা, চিঁড়ে, চিঁড়েভাজা যথেষ্ট থাকে। আগে ঘিয়োর ও খাজা থাকিত; এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। মেলায় মণিহারী দোকান অনেকগুলি থাকে। তাহাতে নানারকম বাঁশী, কাগজের পুঁতুল, কাঠির উপর লাফ্ দেওয়া হনুমান্, কট্‌কটে ব্যাঙ্ কিনিতে পাওয়া যায়। এসব ত গেল ছেলেদের। বুড়োদের একটি বড় দরকারী জিনিস এই মেলায় বিক্রী হয়—নানা রকম গাছের চারা ও কলম। আমাদের দেশে যাহারা বাগান করিতে চায়, তাহাদের চারা কিনিবার এই প্রধান সুযোগ। অনেক নারিকেলের চারা, আমের কলম, নেবুর কলম, সুপারির চারা, লকেট ফলের গাছ, গোলাপজামের গাছ, পিচের গাছ, সবেদার গাছ, ফল্‌সার গাছ এবং গোলাপ যূঁই জাঁতি বেল নবমালিকা কামিনী গন্ধরাজ মুচুকুন্দ বক্ কুরচি কাঞ্চন টগর সিউলি প্রভৃতি নানা ফুলের চারা ও কলম পাওয়া যায়। মেলা আটদিন হয়। প্রথম প্রথম বলিয়া দিলে মালীরা, যে কোনও গাছের চারা চাওয়া যায়, আনিয়া দিতে পারে।

আগে পুঁতুল নাচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোচালার মধ্যে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ রকমের পুঁতুল হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীয়দমন, এসব ত ছিলই; তার উপর একটা মোকদ্দমার সঙ্ ছিল—জজসাহেব বসেছেন, পেশকার কাগজ পেশ করিয়া দিল, কাঠগড়ায় আসামী থাকিল, সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, উকীলের বক্তৃতা হইল, জজসাহেব রায় দিলেন, আসামীর ফাঁসী শাস্তি হইল, ফাঁসীও হইল। ফাঁসীকাঠে ঝুলিলে আসামীর কাপড়ের ভিতর দিয়া এক রকম পদার্থ বাহির হইত দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর এক রকম সঙ্ ছিল—আহ্লাদে পুঁতুল। তার এক গাল হাসি লাগিয়াই আছে। সে হাত পা নাড়ে আর হাসে। রাধাবল্লভের বাটীর

গেটের বাহিরেই গুঞ্জবাড়ী, একখানা খুব বড় পাঁচচালা ঘর। গুঞ্জ-বাড়ী বলিলে অনেকেই মনে করেন কৃষ্ণ রথের সময় মাসীর বাড়ী যাইতেন; সেখানে অনেক ফুলের গাছ ছিল; কুঞ্জ ছিল; কুঞ্জ হইতে গুঞ্জবাড়ী হইয়াছে। কিন্তু সে কথাটা ঠিক্ নয়। গুঞ্জ শব্দের মূল গুণ্ডিচা, অর্থ কুঁড়ে ঘর, তামিল ভাষার শব্দ। উড়িয়ারা জগন্নাথকে গুণ্ডিচা বাড়ী লইয়া যায়, তাই দেখিয়া বাঙ্গালীরাও কৃষ্ণকে গুঞ্জবাড়ী লইয়া যায়। বঙ্কিমবাবুদের পাঁচচালায় কৃষ্ণ আটদিন থাকেন; দিনের বেলায় পুরুষেরা দর্শন করে, সন্ধ্যার পর নানা গ্রামের বৌ, ঝী, গিন্নীবান্নী, আধাবয়সী ও বুড়ীরা আসিয়া দেখিয়া যায়। রাধাবল্লভের পূজারি প্রায়ই একজন খুব বেশকার। নীলমণি ঠাকুর যে বেশ করিতেন, তাহা সত্য সত্যই বলিহারী যাই। বড় বড় যূঁইয়ের গড়ে দিয়ে কৃষ্ণ রাধা ত প্রায়ই ঢাকা থাকেন, তাহার উপর নানা রকম ফুলের গহনা, ফুলের মুকুট, ও ফুলের সাজ করিয়া দেওয়া হয়। সে সাজ দেখিয়া, দেশশুদ্ধ লোক চমৎকার হইয়া যায়। কোন্ দিন কোন্ সাজ হবে, আগে বলিয়া দেওয়া হয়। যাহার যে সাজ দেখিবার ইচ্ছা, সে সেই দিন আসিয়া তাহা দেখিয়া যায়। তা ছাড়া ঘরটিকেও বেশ করিয়া ফুলের মালাটালা দিয়া সাজান হয়। এই ঘরের সামনে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা, চারিদিক্ খোলা, গুটি-কতক চৌকা থামের উপর দাঁড়াইয়া আছে। চালখানি আগে খড় দিয়া ছাওয়া হইত, এখন গোলপাতা দিয়া ছাওয়া হয়। এই আট-চালায় রথের সময় যাত্রা, নাচ, গান, কীর্ত্তন প্রভৃতি হইত। এখন দুই একদিন যাত্রা হয় মাত্র, আগে আটদিনই খুব জমজমাট থাকিত।

আটচালার পশ্চিমে একটি শিবমন্দির, পাথরের শিবলিঙ্গ, নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে বঙ্কিমবাবুর বসিবার ঘর ও পশ্চিম দিকে একটি ঘর, তাহাকে বঙ্কিমবাবু আদর করিয়া তোষাখানা বলিতেন। সেখানে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম থাকিত; হুঁকা, কলিকা, বৈঠক, ফর্সি, গড়গড়া, তামাক, টিকা, গুল, আগুন

দেশালাই ইত্যাদি ইত্যাদি। সে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বঙ্কিমবাবুর চাকর, নাম মুরলী। মুরলীর গলায় তুলসীর মালা, কিন্তু সে যে বিশেষ বৈষ্ণব ভক্ত, তাহা আমরা দেখি নাই। দক্ষিণ দিকে শিব-মন্দির-সংলগ্ন একটি বড় দালান, উহার পূর্ব্বদিকে দুটি দরজা একেবারে খোলা জমীতে পড়িয়াছে, আর পশ্চিম দিকে দুটি জানালা, ঘরটি খুব পশ্চিমে লম্বা। এই ঘরের দক্ষিণে দুটি ঘর। দালানটি যতখানি লম্বা, ঘর দুটিও ততখানি লম্বা। পশ্চিমের ঘরটিতে একখানি খাট থাকিত, পূবের ঘরটিতে একটি ফরাস থাকিত। পশ্চিমের ঘরটিতে বঙ্কিমবাবু দিনের বেলায় শুইতেন, পূবের ঘরটিতে একা বসিয়া লেখাপড়া করিতেন, দুই একজন বিশেষ আত্মীয়েরও সেখানে যাইবার অধিকার ছিল। কখন কখন সে ঘরটিতে দুই একখানি চেয়ার টেবিলও দেখিয়াছি। দালানটিতে দালানযোড়া একটি ফরাস পাতা থাকিত, অনেকগুলি তাকিয়া থাকিত, হারমোনিয়ম থাকিত, সময়ে সময়ে অন্যান্য অনেক রকমের বাজনাও থাকিত। দালানের উত্তর দিকে একটি দরজা থাকিত, সেই দরজা দিয়া তোষাখানায় যাওয়া যাইত।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, যে-কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসব হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে কবি, তাহার কোন নিদর্শনই এখনও দিই নাই। সে নিদর্শনটি তাঁহার শুইবার ও বসিবার ঘরের দক্ষিণ দিকে দেখা যাইত। সে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান, দুকাঠাও পূরা হইবে না। ঘর দুটি একত্রে যতখানি লম্বা, বাগানটিও ততখানি লম্বা, আড়েও প্রায় ঐরূপ, তিনদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা, সে পাঁচিলের আগায় একটি আল্সে ও তাহার নীচে একটি বেঞ্চি। চারিদিকেই এইরূপ। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি চৌকা গাঁথান, হাতখানেক উচা, তাহারও আবার মাঝখানে একটি ছোট চৌকা হাতখানেক উচা, তাহারও মাঝখানে আবার একটি চৌকা হাতখানেক উচা। চারিদিকেই যেন গ্যালারি মত। এই সমস্ত গ্যালারিতে চারি-

দিকেই টব সাজান থাকিত। টবে নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমী ছিল, তাহাতে শুরকীর কাঁকর দিয়া রাস্তা করা। বাকী জমীতে যূঁই জাঁতি কুঁদ মল্লিকা ও নবমালিকার গাছ। বর্ষাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া যাইত, এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপূর হইয়া যাইত। বঙ্কিমবাবু বাগানটিকে বড়ই ভাল বাসিতেন, যতদিন তিনি বাড়ী থাকিতেন, বাগানটি খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন ও মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আল্‌সেটিতে হেলান দিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।

আমরা বালককালে প্রতিবৎসরই রথ দেখিতে যাইতাম। রেলওয়ের গেট হইতে শিবের মন্দির পর্য্যন্ত দুইধারে অনেকগুলি কামিনীফুলের গাছ ছিল। আমরা প্রায়ই ফুল ছিঁড়িতাম। ফুল ছিঁড়িলেই কেহ না কেহ আসিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইত "তোমাদিগকে ধরিয়া সঞ্জীববাবুর কাছে লইয়া যাইব।" সঞ্জীববাবু আমাদিগকে কি শাস্তি দিতেন জানিতাম না, কিন্তু সেই অবধি আমরা জানিতাম যে শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর মহাশয়ের পুত্রেরা বড় দুষ্ট লোক, ছেলে-পিলে ধরিয়া মারেন, সেই ভয়ে আমরা অনেকবার সুযোগ হইলেও রায়বাহাদুরের বাড়ী বড় একটা যাইতাম না। একবার ধরণীকথকের কথা হইয়াছিল। তখন আমার বয়স বছর এগার, টোলে পড়িতাম। টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে দু'চার দিন ধরণীকথকের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। রায়বাহাদুরের বাহির বাড়ীর পাঁচফুকরে দালানের সামনে যে উঠান আছে, সেই উঠানে কথা হইত। কথকের জন্য যেমন সব জায়গায় ইটের বেদী হয়, এ বাড়ীতে তাহা হয় নাই। একখানা বড় চৌকি ও একটা বড় তাকিয়া বেদীর কাজ করিত। ঐ বেদীর উপর একখানি ভাল গালিচা পাতা থাকিত। সামনে একটি বড় টিপায়ের উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন, তিনি কথার প্রধান শ্রোতা। উঠানময় গালিচা ও সতরঞ্চ পাতা থাকিত; ব্রাহ্মণেরা গালিচায় বসিতেন,

শূদ্রেরা সতরঞ্চে বসিত। ধরণীকথক মহাশয় খুব ভাল কথা কহিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর ও উচ্চ স্বরে প্রথম হইতেই আসর জমজম করিত। কিন্তু তিনি যখন হাঁ করিয়া গালের কাছে হাত আনিয়া গান ধরিতেন, তখন সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা তখন গানের কি বুঝি? কিন্তু এখনও সে সুর কানে লাগিয়া আছে। শুনিয়াছি বাড়ী হইতে কিছুদূর, পূর্বদিকে, সঞ্জীববাবুর ফুলবাগানে ধরণীকথকের বাসা ছিল। সে ফুলবাগান দেখিবার আমাদের খুবই সখ ছিল, কিন্তু পাছে সঞ্জীববাবু আমাদের মারেন, সেই ভয়ে কোনদিন সে দিকে যাই নাই। চারি পাঁচদিন ধরণীকথকের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পর একদিন গিয়া শুনিলাম, তাঁহার শরীর বে-এক্কার হইয়া গিয়াছে, তিনি আসিবেন না। তাহার পর আর কোনদিন তাঁহার কথা শুনিতে যাই নাই, তাঁহার ত আর ঠিক ছিল না, কোনদিন আসিবেন, কোনদিন আসিবেন না।

আঠার শ চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ডইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকার একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র "On the highest ideal of woman's character as set forth in ancient Sanskrit writers" একটি 'এসে' লিখিতে পারিবে, তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমিও চেষ্টা কর।' কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৫ সালের প্রথমেই 'এসে' দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষা করিতেও এক বৎসরের বেশীই লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর সালের প্রথমে আমি বি, এ পাস করিলাম, উমেশবাবুও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারসিপ্ পাইলেন।

প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু মনে করিলেন সংস্কৃত কলেজের বেশ ভাল ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকার বাঙ্গলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্প্‌লকে আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেইদিন শুনিলাম রচনার পুরস্কার আমিই পাইব। সার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক্ দিলেন ও কতকগুলি বেশ মিষ্ট কথা বলিলেন।

আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা যে রচনা ভাল বলিয়াছেন এবং গবর্ণর সাহেব যাহার জন্য আমায় এতগুলি মিষ্ট কথা বলিয়া গেলেন, সেইখানি ছাপাইয়া দিয়া আমি কেননা একজন গ্রন্থকার হই? তাহার পর ভাবিলাম এম. এ. ক্লাস পর্য্যন্ত ত একরকম স্কলারসিপেই চলিয়া যাইবে। তাহার পর হঠাৎ কিছু আর চাকরি পাওয়া যাইবে না। তখন প্রাইজের ঐ কটি টাকাই আমার ভরসা। অতএব বই ছাপাইয়া ঐ কটি টাকা খরচ করা হইবে না। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুক্তবাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম. এ., মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের এম. এ. আমার উপর তাঁহার স্নেহদৃষ্টি থাকা সম্ভব, সুতরাং তিনি তাঁহার মাসিকপত্র 'আর্য্যদর্শনে' আমার লেখাটি স্থান দিলেও দিতে পারেন। তাঁহার কাছে গেলে, খুব গম্ভীরভাবে, বেশ মুরুব্বি-আনা চালে বলিলেন, "তুমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া তুমি পুরস্কার পাইয়াছ, আমার কাগজে উহা ছাপান উচিত। কিন্তু তুমি বাপু যে সকল 'ভিউ' দিয়াছ, আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আমার ত মহাশয় নিজের কোন 'ভিউ' নাই। পুরাণ পুঁথিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি।" যাহাহোক তিনি উহা ছাপাইতে রাজী হইলেন না। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, আপাততঃ গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

তাহার পর একদিন চাঁপাতলার ছোট গোলদীঘীর ধার দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি, শ্রীযুক্তবাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হইল। তিনি ও তাঁহার দাদা বাবু রাধিকা-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বেশ জানিতেন, আমাকে বেশ স্নেহ করিতেন, কিন্তু আমি তিন চারি বৎসরকাল তাঁহাদের বাড়ী যাই নাই বা তাঁহাদের কাহারও সহিত দেখা করি নাই। তিনি সে জন্য আমাকে বেশ মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং আমাকে অতি সত্বর তাঁহাদের বাড়ী যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাদের বাড়ী গেলেই এই তিন চারি বৎসর কি করিয়াছি তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচনাটির কথা উঠিলে তিনি সেটি দেখিতে চাহিলেন। আমি একদিন গিয়া তাঁহাকে উহা দেখাইয়া আসিলাম। তাহার পর তিনি আমায় একদিন বলিলেন, "তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাম, "আর্য্যদর্শনে যাহা লয় নাই, বঙ্গদর্শনে তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না"। তিনি বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি রবিবারের দিন নৈহাটি ষ্টেসনে অপেক্ষা করিও, আমি সেই সময়ে সেখানে পৌঁছিব।" যথা-সময়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রেলের ভিতর দিয়াই বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে শুনিলেন যে তাঁরা চারি ভাই শ্যামাচরণবাবুর বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতেছেন। তারের বেড়া ডিঙ্গাইলেই শ্যামাচরণ বাবুর বাড়ীর দরজা। রাজকৃষ্ণবাবু বাড়ী ঢুকি-লেন, তাঁহার সঙ্গে আমারও এই প্রথম প্রবেশ। রাজকৃষ্ণবাবুকে তাঁহারা খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, আমিও বসিলাম। নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। চার ভাইয়েরই নাম শুনা ছিল, আমি তাঁহাদের গল্পের মধ্যেই কোনটি কে, চিনিয়া লইলাম। ক্রমে বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে?" তিনি বলিলেন, "এটির বাড়ী নৈহাটি, সংস্কৃত কলেজে পড়ে, এবার বি. এ. পাস করিয়াছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন

"ব্রাহ্মণ"? রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হাঁ"। তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটি বাড়ী, ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত কলেজে পড়, বি. এ. পাস করিয়াছ, আমাদের এখানে আস না কেন?" আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "সঞ্জীববাবুর ভয়ে"। তাঁহারা সকলেই ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আমার ভয়? কেন?" "শুনিয়াছি কামিনীগাছের ফুল ছিঁড়িলে আপনি নাকি মারেন।" হাসির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটি? তোমার বাবার নাম কি?" আমি বলিলাম, "৺রামকমল ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়"। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তুমি রামকমল ন্যায়রত্নের পুত্র, নন্দর ভাই, রাজকৃষ্ণ তোমাকে আমার নিকট আনিয়া আলাপ করাইয়া দিল। তোমার দাদার সঙ্গে আমার ভারি ভাব ছিল। সে আমার একবয়সী ছিল। তারমত তীক্ষ্ণবুদ্ধির লোক আর দেখা যায় না"—বলিয়া তিনি দাদার সম্বন্ধে নানা গল্প বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম, দাদার উপর তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে।" অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন "কি কাজ?" রাজকৃষ্ণ-বাবু বলিলেন, "ও একটি রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে হইবে"। বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, "বাঙ্গলা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা, তারা ত নিশ্চয়ই 'নদনদী পর্ব্বত কন্দর' লিখিয়া বসিবে।" আমি বলিলাম, "আমার রচনার প্রথম পাতেই 'নদনদী পর্ব্বত কন্দর' আছে," বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, "প্রথম চারিটি পাত ও সকলের শেষে আমি ঐ ভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে জানিয়াই আমার ঐরূপ ভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ"। তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "নন্দের ভাই বাঙ্গলা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই

হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।” আমি তিনটি পরিচ্ছেদমাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে উহা দিয়া দিলাম। তাহার পর অনেক মিষ্টালাপের পর আমি বাড়ী গেলাম, রাজকৃষ্ণবাবু সেখানে রহিয়া গেলেন।

এই সময়ে কাঁটালপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ ছিল। লোকে তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও আচারব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিল “রামফক্কড়”। নৈহাটি ও কাঁটালপাড়া গ্রামে সকল বাড়ীতেই তাঁর অবারিতদ্বার ছিল। তিনি সব বাড়ীতেই যাইতেন, সকলের সঙ্গেই ফক্কুড়ি করিতেন ও ফক্কুড়িই তাঁহার জীবিকা ছিল। বঙ্কিমবাবুর নিকট অনেক আদর যত্ন পাইয়াও আমি মাসাবধি তাঁহার বাড়ী যাই নাই, যাইবার ভরসাও করি নাই। একদিন রামফক্কড় আমায় আসিয়া বলিল, “তুমি বঙ্কিমকে কি দিয়া আসিয়াছ ?” আমি বলিলাম, “একটা লেখা”। সে বলিল, “তাই বটে! বঙ্কিম একটা প্রুফ দেখিতেছিল, আর বলিতেছিল ‘নন্দর ভাইটি বেশ বাঙ্গলা লিখিতে শিখিয়াছে’, তুমি সেখানে যাওনা কেন ? বোধ হয় গেলে সে খুসী হ’বে”। রামবাড়ুয্যের কথায় ভরসা পাইয়া আমি আর একদিন বঙ্কিমবাবুর কাছে গেলাম। তিনি বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, “তুমি এসেছ, বেশ হ’য়েছে। তুমি এমন বাঙ্গলা লিখিতে শিখিলে কি করিয়া ?” আমি বলিলাম, “আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের চেলা।” তিনি বলিলেন “ওঃ! তাই বটে! নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাঙ্গলা বাহির হইবে না।” সেইমুহূর্ত্ত হইতে বুঝিলাম যে বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা ভাবটা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। সেদিনকার মত গম্ভীর ভাব আর নাই। তিনি আমাকে একেবারে আপন করিয়া লইতে চাহেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ উহার বাকী আছে, সেগুলি আপনি একবার দেখিবেন কি ?” তিনি বলিলেন “নিশ্চয়ই”। আমি আর একদিন তাঁহার কাছে বাকী অধ্যায়

কয়টি লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। কিন্তু বাকীগুলি সমস্তই পুরাণ অথবা কাব্য হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রীচরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মনদিয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি চলিবে কি?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "যাহা ছাপাইয়াছি সে রূপা, এসব কাঁচা সোণা"। বলিতে কি, সেদিন আমি ভারি খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তাহার পর যখন নৈহাটি হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিতাম, তখন প্রায় প্রত্যহই তাঁহার কাছে যাইতাম। যখন কলিকাতায় বাসা থাকিত, তখন শনিরবিবার বৈকালে তাঁহার কাছে যাইতাম।

কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরামশিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন। ভাল শাব্দিক হইলেও শিরোমণি মহাশয়ের কাব্য বুঝিবার ক্ষমতা খুব ছিল। আমি তাঁহার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষ অংশ ও জয়কৃষ্ণের সারমঞ্জরী পড়িয়াছিলাম। তাহারপর তিনি আমাকে নৈষধ পড়াইতে আরম্ভ করেন। নৈষধ পড়িতে গিয়া কাব্যাংশেই তিনি বুঝাইতে চান, ব্যাকরণ বা দর্শনের দিকে তিনি ফিরিয়াও চান না। সেকালের টোলের পণ্ডিতেরা অলঙ্কার খুব কমই পড়িতেন। যদি বা দুই এক জন পড়িতেন, তাঁহারা কাব্যপ্রকাশের জগদীশ তর্কালঙ্কারের টীকা পড়িতেন ও ন্যায়শাস্ত্রের কচ্‌কচি লইয়াই থাকিতেন। সেকালে লোকে যে সকল ইংরাজী কাব্য পড়িত সে সকলই বঙ্কিমবাবুর পড়া ছিল। বাঙ্গালায় তিনি কীর্ত্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি কীর্ত্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদুভট্টের নিকট গান শিখিতেন, একটি

হারমোনিয়মও কিনিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতে-ছেন, ইহাও দেখিয়াছি; কিন্তু তাঁহাকে দলনী বেগমের ন্যায় গুনগুন করিয়া ছাড়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে কখনও শুনি নাই। তিনি বাল্যকালে কবিতা লিখিতেন। বাল্যকালের কবিতাগুলি তিনি একত্র করিয়া ছাপাইয়াওছিলেন। কিন্তু বয়স হইলে তিনি কবিতা লেখা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশী সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ফ্লরেন্সের মেডি-চিদের কথা কহিতেন। "রিনাইসেন্স" (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গলারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করি-তেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গলার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' বলিয়া বঙ্গদর্শনে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তাঁহার কিছু জানিবার দরকার হইলে আমায় বলিতেন, আমিও যথাসাধ্য প্রাচীন পুঁথি ঘাটিয়া তাঁহাকে খবর যোগাইয়া দিতাম। এই তিরিশ বছরের মধ্যে বাঙ্গলার ইতিহাস অনেক পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানেরা বাঙ্গালা দখল করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে অনেক বড় বড় রাজত্ব ছিল, এখন তাহার অনেক আভাস পাওয়া গিয়াছে, তখন সব অন্ধকার ছিল। তথাপি বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশে আর্য্য ও অনার্য্য-গণের বাস সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তার চেয়ে এখনও কেহ বেশী কিছুই লিখিতে পারেন নাই।

আমার সহিত বঙ্কিমবাবুর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও রজনী ছাপা হইয়া গিয়াছিল। কমলাকান্তের দপ্তর তখনও শেষ হয় নাই। বঙ্গদর্শন তিন বৎসর নয় মাস বাহির হইয়াছিল। আমার ভারতমহিলা লইয়া বাকী তিন মাস পূর্ণ হয়। চারি বৎসরের পর তিনি বঙ্গদর্শনের
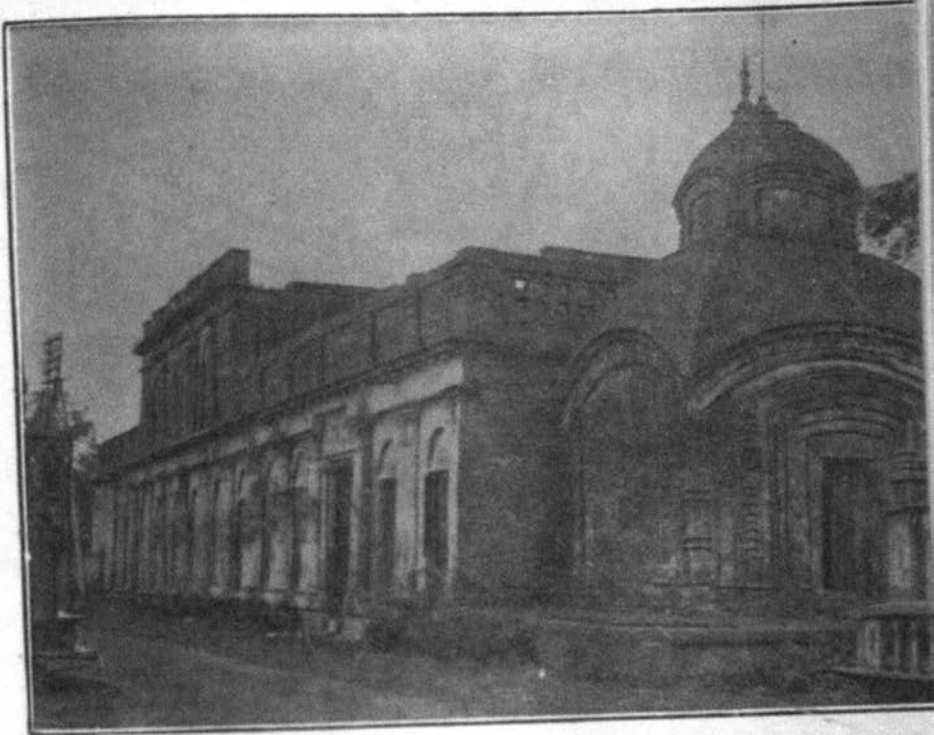
বঙ্কিমবাবুর পৈত্রিক বাটীর সম্মুখভাগ।

BIJOYA PRESS

সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন। কেন ছাড়িয়া দেন, অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কোন খোলসা জবাব পাই নাই। টাকার অভাবে যে উহা ছাড়েন নাই, তা নিশ্চয়; কেন না, বঙ্গদর্শনের গ্রাহক-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল, গ্রাহকেরাও বঙ্গদর্শনের টাকা দিতে নারাজ ছিল না। তিনি ছাপাখানার কাজ বেশ বুঝিতেন। তবে সম্পাদকতা ছাড়িলেন কেন, ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয় তিনি ঝঞ্ঝাট ভাল-বাসিতেন না, এবং সঞ্জীববাবুর একটা উপায় হয়, সেটাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সঞ্জীববাবু খুব রসিকলোক ছিলেন, একদিন একজন বড় সাহেবের সহিত রসিকতা করিতে গিয়া তাঁহার ডেপুটিগিরিটি যায়।*

---

* সঞ্জীববাবু তখন প্রোবেশনারি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। কয়েকটি পরীক্ষায় পাস হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪ সালে 'ডিষ্ট্রীক্ট টাউন্‌ এক্ট' পাস হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজসাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা কমিশনার হইলেন; সঞ্জীববাবুও একজন কমি-শনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠিল—রাস্তার নাম দিতে হইবে, টিনের উপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় দিতে হইবে; সব্যস্ত হইল ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজ্ সাহেব বলিলেন, "আরও ৭৫৲ টাকা চাই, কারণ বাঙ্গলা নামগুলা কে বুঝিবে? ওগুলা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া দিতে হইবে। বৌমার গলি বলিলে কেহই চিনিবে না, Daughter-in-law's Lane বলিতে হইবে।" জজসাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছেন না, অথচ তিনি বার বার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন, "৭৫৲ টাকায় হইবে না। আমি প্রস্তাব করি আরও ৩০০৲ টাকা দেওয়া দরকার।" জজসাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন?" সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিতে হইবে। মনে করুন কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে? উহাকে Black-footed Friend বলিয়া তর্জ্জমা করিতে হইবে।" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জজ সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি টুপী লইয়া কমিটি হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "সঞ্জীব ভাল কাজ করিলে

তখন দিনকতক তিনি সব্‌রেজিষ্ট্রার থাকিলেন, কিন্তু এখানেও তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্য্যতঃ বঙ্গদর্শনের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, অন্য লোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পূর্ব্বেও তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, বঙ্গদর্শন এখনও তেমনি চলিতে লাগিল। নূতন বঙ্গদর্শনে নূতনের মধ্যে আমি, আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনও নাম সই করি নাই। সেইজন্য এখন সেইসকল লেখা যে আমার, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।

নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রায় বছরখানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি এবং সেখানে এক বৎসর থাকি। আমি যেদিন যাই, সেইদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়া ভিজা বাঁধান একখানি কৃষ্ণকান্তের উইল আমাকে দিলেন, বলিলেন "রেলগাড়ীতে এইখানি পড়িও, ছাপাখানা হইতে এইখানা প্রথম বাহির হইল।" আমি অনেক বৎসর ধরিয়া সেখানি বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই আমার বাড়ীতে নাই। বৌঠাকুরাণীরা

না। বাড়ী গিয়া উঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস।" সঞ্জীববাবু তিন দিন গেলেন, জজসাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেব দেখা করিলেন না। সপ্তাহখানেক পরে খবর আসিল জজসাহেব সেক্রেটারী হইয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু তিন চারিবার পরীক্ষা দিলেন, কিছুতেই পাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার নাম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জজসাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাস করিতে না পারিবার কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কিনা জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন আছে।

অনেকগুলি সখীদের দিয়াছেন, এখন পুত্রেরা বড় হইয়া কতকগুলি আপন আপন বন্ধুদের দিয়াছেন। আমার এত যত্নের জিনিস একখানিও বাড়ীতে নাই!

লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আমি কাঁটালপাড়ায় গিয়া দেখি বঙ্কিমবাবু সেখানে নাই। শুনিলাম তিনি চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন। শিবের মন্দিরের পাশে সে ঘরগুলিতে চাবীবন্ধ। বাগানটি গতপ্রায়। সেই দিনই বৈকালে চুঁচুড়ায় গেলাম, দেখিলাম চুঁচুড়ার ঘোড়াঘাটের উপর দুইটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন, একটিতে তাঁহার অন্দরমহল, আর একটিতে তিনি নিজে বসেন। যেটিতে তিনি বসেন, সেটি একতালা। বাড়ীটির একটি গেট আছে। যে ঘরটিতে তিনি বসেন, তাহা একটি বড় হল, গঙ্গার দিকে চারিটি জানালা। সে ঘরের পূর্ব্বের দেওয়ালটি গুটিকতক বড় বড় মোটা গোল থামের উপর, বর্ষাকালে তার নীচেও জল আসে। বঙ্কিমবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেদিন তার নীচে খুব জল ছিল। এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি খুব খুসী হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ত চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু 'কৃষ্ণকান্ত' আছে?" তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি বড় খুসী হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশী কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লক্ষ্ণৌ হইতে আমি বঙ্গদর্শনের জন্য যে কয়টি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম, পড়িয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন, "তুমি যেটির কথা মনে করিয়া বলিতেছ, সেটি কোন জার্ম্মান পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয়।" আমি আর কিছু বলিলাম না। সে প্রবন্ধটির নাম "বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি"—অর্থাৎ তিনজন কবির বহি কলেজের ছাত্রেরা খুব আগ্রহের সহিত পড়ে, এবং এই তিনজন কবির কথা লইয়াই তাহারা আপনাদের 'চরিত্র গঠন করে'—সেই তিনজন কবি বাইরন, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

অৰ্জ্জুনা পুষ্করিণী

অনেকে এই পুষ্করিণীকে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের বারুণী পুষ্করিণী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। 'বারুণী' পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার সৃষ্টি মাত্র। এই পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রদিগের পৈতৃক। গ্রামোপান্তে অতি নির্জ্জন স্থানে উহার খনন হইয়াছিল, কিন্তু কোন্ সময়ে উহা খাত হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। অর্জ্জুনা পূর্ব্বে সুবৃহৎ জলাশয় ছিল, জল দেখা যাইত না, পদ্মপত্রে ঢাকা থাকিত, আর উহার উপর অসংখ্য পদ্মফুল বায়ুতাড়িত হইয়া দুলিত। চারিদিকের পাড় আম্রকাননে সুশোভিত। এই আম্রবনের গাছে গাছে অসংখ্য পাখী বাস করিত। প্রাতে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় সকল সময়েই তাহাদের কলরবে এই নির্জ্জন সরোবরের চিরনিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইত।

এই পুষ্করিণী এক্ষণে মজিয়া গিয়া সঙ্কীর্ণ আয়তন হইয়াছে এবং পাড়ে পাড়ে প্রজা বসিয়াছে। ইহার সে রম্যতা আর নাই।

'অর্জ্জুনা'র উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রদিগের ফুলবাগান ছিল, উহাতে একটি ক্ষুদ্র বাগানবাটীও ছিল, এক ব্যক্তি উহাতে কিছুদিন বাস করিতে পারিত, কোন কষ্ট হইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ঐ বাগানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন, পরে বঙ্কিমচন্দ্র উহা একটি উৎকৃষ্ট ফুলবাগান করিয়াছিলেন। তেরচৌদ্দবর্ষ বয়ঃক্রমে জলপানি পাইয়া ঐ টাকা হইতে এবং পিতৃদেবের সাহায্য হইতে হুগলি কলেজের মালীর দ্বারা নানাপ্রকার ফুলের চারা আনাইয়া রোপণ করিয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে বিশ্রামের জন্য ইষ্টক-নির্ম্মিত বসিবার স্থান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঐ বাগানের পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দিকে বড় বড় মনসা-কাঁটার বেড়া ছিল, আর দক্ষিণ দিকে ইষ্টক-নির্ম্মিত ভিতের উপর

রেলিং ছিল ও একটি ফটক ছিল। এই রেলিংএর পরই অর্থাৎ বাগানের দক্ষিণেই 'অর্জ্জুনা'। মাঠাল গ্রামে যাইবার জন্য কেবল মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই ফুলবাগানে ও পুষ্করিণীর পাড়ে বেড়াইতে ভাল বাসিতেন এবং যতদিন না তাঁহাদের বসতবাটীর সম্মুখে একটি বৈঠকখানাবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ততদিন এই ফুলবাগানে সর্ব্বদা থাকিতেন। ঐ ফুলবাগানের এক্ষণে আর কোন চিহ্ন নাই, ঐ জমিতে এখন প্রজা বসিয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী

আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম।

বঙ্কিমচন্দ্র গোড়ায় যেমন ভাবে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে শেষের তিনখানি উপন্যাস লেখেন নাই। গোড়ায় তিনি কাব্যসৃষ্টি, ভাবসৃষ্টি এবং রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, শেষে একটা উদ্দেশ্য লইয়া তিনি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মতত্ত্বে, গুরুশিষ্যের কথোপকথনে, স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, অনুশীলন-তত্ত্ব একটা কল করিয়া বুঝাইয়া দিব। সে কল উপন্যাস; সে কল তাঁহার শেষের তিনখানি উপন্যাস। এই তিনখানি উপন্যাসের বিন্যাস বুঝিতে পারিলে, বুঝা যাইবে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ-তত্ত্ব কি ভাবে এবং কোন্ দিক্ দিয়া বুঝিতেন।

গোড়ায় বলিয়া রাখি যে, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি হিসাবে পেট্রিয়ট ছিলেন। তিনি সমাজের মঙ্গলকামী কবি ছিলেন। তিনি সমাজকে ইউরোপের আদর্শে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গড়িতে কখনই চেষ্টা করেন নাই। তিনি Iconoclast পুরাদস্তুর ছিলেন না; Ecclecticism-এরও তিনি ষোল আনা সমর্থন করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্ঘাতে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে আচার-ব্যবহারগত পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই পরিবর্ত্তনকে দেশের ও জাতির প্রকৃতির অনুকূল করিয়া পরিচালিত করা প্রত্যেক দেশ-হিতৈষীরই কর্ত্তব্য। কমটির পজিটিভিজম্ তাঁহার মনীষার উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, প্রতিবেশ প্রভাব আমরা এড়াইতে পারিব না; আমাদের অতীতের ইতিহাস এবং তজ্জন্য প্রাণাবুদ্ধি আমরা পরিহার করিতে পারিব না, আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা ইংরেজি শিক্ষা এবং সভ্যতা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সুতরাং যে উপায়ে জাতিকে ধরিতে পারি, জাতির নিম্ন

স্তরগুলিকে টানিয়া, সঙ্গে করিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি সেই উপায়ই আমাদের অবলম্বনযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় প্রাদেশিকতার ভাবটা সর্ব্বপ্রথমে ফুটাইয়া তোলেন। তিনি অনেকবার বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার বাঙ্গালী প্রথমে নিজেকে চিনিতে শিখুক, নিজের জাতির দোষগুণ বিশ্লেষণ করিতে পারুক, তবে সে গোটা ভারতবর্ষের চিন্তা করিতে পারিবে ও জানিবে। কবি রঙ্গলাল হইতে হেমচন্দ্রের প্রথম দশা পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আধুনিক কবিগণ গোটা ভারতবর্ষ লইয়া দেশহিতৈষণা বা দেশাত্মবোধের চর্চ্চা করিতেন। তখন বাঙ্গালার কবি রাজস্থান লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, পুরাণেতিহাস লইয়া দেশগীতি গান করিতেন। তখন বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয় নাই, তখন বাঙ্গালী ইংরেজের দেওয়া কাপুরুষতার দুরপনেয় কলঙ্কলেপে কলঙ্কিত ছিলেন। এ কলঙ্ক ভঞ্জনের চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বাগ্রে করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম লিখিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্কাপনোদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" বাঙ্গালার গান, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে; এই তিনখানা উপন্যাসে কেবল বাঙ্গালার বাঙ্গালীর কথা আছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ইঙ্গিত মাত্র নাই। এই তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালার পরিচায়ক, বাঙ্গালিত্বের পরিচায়ক, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা সবাই বাঙ্গালী, দেবীচৌধুরাণী বাঙ্গালী কুলাঙ্গনা, সীতারাম বাঙ্গালী ভৌমিক, চন্দ্রচূড় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। এই তিনখানা উপন্যাসই বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" গানই বাঙ্গালীকে বঙ্গভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালীকে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছিলেন। তাই বঙ্গভঙ্গের সময়ে, যখন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি খাস বাঙ্গালার উপর নিপতিত

হইল, তখনই "বন্দে মাতরম্‌" গান বাঙ্গালীর কোটি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। মালমসালা বঙ্কিমচন্দ্র তৈয়ার করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, কেবল সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। বঙ্গভঙ্গে সে সময় ও সুযোগ দেখা দিল, আর আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম নূতনভাবে বাঙ্গালার লোক-লোচনের গোচর হইল। এই তিনখানি উপন্যাস বাঙ্গালার দেশাত্মবোধের ত্রিপদ বেদী।

এই তিনখানি উপন্যাসে, বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন-পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; দেবীচৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা State বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে তাহার পর্য্যায় দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত, জাতিগত, এবং সংস্কার-গত দোষে বা চ্যুতির ফলে কেমন করিয়া আদর্শ সৃষ্ট হইল না, তাহাও তিনি অপূর্ব্ব চরিত্রোন্মেষ সাহায্যে দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। তন্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তকে মান্য করিতে হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের পর্য্যায়ে একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। তন্ত্র বলেন যে, সর্ব্বাগ্রে ব্যষ্টি বা সাধককে তৈয়ার করিয়া তুলিতে হইবে, পরে ব্যষ্টি বা ব্যক্তির প্রভাবে সমাজকে আদর্শের অনুকূল করিতে হইবে, শেষে সমন্বয় সাধন করিয়া মাতৃ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র কম্‌টির ফিলজফির প্রের-ণায় সর্ব্বাগ্রে Environment বা প্রতিবেশ প্রভাব ঠিক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালায় বাঙ্গালী-জাতির সহিত কাজ করিতে হইলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই। মায়ের খাস তালুকের প্রজা হইতে হইলে গৈরিক বসন ধারণ করিতে হইবে। সমাজ-সংস্কার, ধর্ম্মপ্রচার বা জাতির উদ্বোধন বাঙ্গালায় সর্ব্বত্যাগী সাধক সন্ন্যাসী ছাড়া কেহ করে নাই, কেহ পারে নাই। তাই সন্ন্যা-সীর গৈরিক লেখা তাঁহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে যেন উজ্জ্বল হইয়া

ফুটিয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, এই দুই জাতি ছাড়া সমাজের কোনরূপ ভাঙ্গা গড়া হয় নাই। তাই তিনি এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। আনন্দমঠে মহেন্দ্র সিংহ সন্তান বটে, কিন্তু তিনি সন্ন্যাস পান নাই। দেবীচৌধুরাণী ব্রাহ্মণ কন্যা; সীতারাম কায়স্থ ভৌমিক ও সেনাপতি। আনন্দমঠে তিনি ঠিক সাম্প্রদায়িক ভাবে সমাজের সংস্কার চেষ্টা করিয়াছেন; দেবীচৌধুরাণীতে শক্তিকে সর্ব্বসিদ্ধির আধারভূতা করিয়া বঙ্গীয় মানবতার উন্মেষ সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন; সীতারাম উপন্যাসে শক্তি-বিরূপা হইলে, পুরুষ মোহান্ধ হইলে, কেমন বাড়া ভাতে ছাই পড়ে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালিত্বের শ্লাঘা ও অপহ্নব ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন, কিছুই ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই।

মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র আদিরসের মহাকবি। তাঁহার সকল উপন্যাসেই আদিরসের নানা অবস্থাগত বিশ্লেষণ আছে। তিনি বাঙ্গালার ইংরেজি-নবীশ বা উদ্ধত নায়কনায়িকাই ভাল করিয়া আঁকিয়াছেন, মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু সখা অন্য কোন ভাবের কথাই ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। বিলাতের যে আদিরসের Romanticism বায়রণ হইতে ব্রাউনিং পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার মোহ এড়াইতে পারেন নাই। শেষের তিনখানা উপন্যাসে সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে যাইয়াও তিনি আদিরসের হাত এড়াইতে পারেন নাই। আদিরসের মৈনাকের উপর তাঁহার অনেক ভাবের নৌকা কাঁসিয়া গিয়াছে। যেন তিনি বাঙ্গালীকে বার বার বলিয়াছেন যে, এই আদিরসের গুপ্ত পর্ব্বতের সংঘাতে তোমার তন্ত্র ধর্ম্ম, তোমার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম—তোমার সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। যদি ইউরোপের আদর্শে দেশাত্মবোধের অর্ণবযান বাঙ্গালার ভাবের লহরের উপর ভাসাইতে হয়, তাহা হইলে

সাবধান আদিরসের চোরা বালির উপর, ডোবা পাহাড়ের উপর দিয়া নৌকা চালাইও না; পূর্ব্বেকার অনেক সাধের সামগ্রীর মতন উহাও ফাঁসিয়া যাইতে পারে। ভবানন্দের কল্যাণীর রূপে মোহ, দেবীরাণীর ব্রজেশ্বরের প্রতি মোহ ও ঘর-গৃহস্থালীর প্রতি অনুরাগ, সীতারামের শ্রীর জন্য উন্মত্ততা, শ্রীর ভ্রাতার—গঙ্গারামের রমার রূপে মোহ,—এ সকলই উদ্ভট হইলেও, ঐ এক কথাই বুঝাইতেছে,—ঐ রিরংসার হলাহল বিস্তারের পথ ও প্রণালী দেখাইয়া দিতেছে। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র স্বেচ্ছায় dramaকে নষ্ট করিয়া, উৎকটের আশ্রয় লইয়া উপদেশের সার্থকতা সাধনে অধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি যে situation সৃষ্টি করিতে যাইয়া এতটা প্রমাদ করিবেন, ইহা ত বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী জাতির সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক ইতিহাস কথা ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এতটা প্রচারিত হয় নাই। তিনিই বরং বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার ইতিহাস জানিতে ও বুঝিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালার অনেক বিস্মৃত কথা ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ত জানিতেন না যে, বাঙ্গালার নারী চিরদিন এমন বিহ্বলা ও অবলা ছিল না। তিনি ত জানিতেন না যে, বাঙ্গালার অধ্যাপক-গৃহিণী স্বামীর অনুপস্থিতিকালে ছাত্রদের ন্যায় ও অলঙ্কারে পাঠ দিতেন। তিনি ত বাঙ্গালার ভৈরবী দেখেন নাই, এমন কি বাঙ্গালার শেষ ভৈরবী বিন্দুবাসিনীকেও দেখেন নাই। তিনি জানিতেন না যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ঘরের মেয়েরা এখনকারমতন কাপড় পরিত না; তাহাদের অনেকের হিন্দুস্থানী বা দাক্ষিণাত্যের ঢঙের কাপড় পরা ছিল। এখনকার কাপড়পরা ইংরেজের আমলের কিছু পূর্ব্ব হইতে ধীরে ধীরে প্রচলিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়ে যে সত্যই লড়াই করিতে পারিত, পাঠানদের সহিত লড়াই করিয়াছিল, রঘুডাকাতকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে সব খবর তিনি ঠিকমত জানিতেন না। অর্থাৎ এ সকল সমাচারকে তিনি

historical truth বলিয়া গ্রহণ করিবার অবসর পান নাই। ডেপুটী ম্যাজেষ্টরী চাকরি করিতে করিতে বাঙ্গালার অনেক জেলায় তাঁহাকে ঘুরিতে হইয়াছিল, অনেকের মুখে অনেক গালগল্প, অনেক কিম্বদন্তী তিনি শুনিয়াছিলেন। তাহারই উপর স্বীয় অপূর্ব্ব কল্পনা চড়াইয়া তিনি শান্তি, শ্রী, নন্দা, প্রফুল্ল প্রভৃতির চিত্র আঁকিয়াছেন। ঐ সকল চিত্র ঠিক বাঙ্গালার নহে; অথচ উহাদের উপরে বাঙ্গালিত্বের মোটা গালার রঙ, বেশ জোর করিয়া বসান আছে। শ্রীকে বা শান্তিকে দেখিলে মনে হয়, যেন উহারা বাঙ্গালার ভৈরবী, বাঙ্গালার কুলাঙ্গনা; অথচ একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় বাঙ্গালায় এমন চরিত্র ফুটিবার নহে; তথাপি কিন্তু উহাদের উপর এমন একটা বাঙ্গালীয়ানা মাখান আছে, যাহার মোহ এড়ান যায় না। এইভাবে কতকটা কাল্পনিক, কতকটা আধুনিক উপাদান লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষের তিনখানা উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

এই তিনখানা উপন্যাসের situation বা ঘটনাসঙ্গতি ফুটাইতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সাহায্য লইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ঐতিহাসিকতা বজায় রাখেন নাই। আলেখ্যের ground work বা ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যত্যয় ঘটান যায় বটে। উপন্যাস ইতিহাস নহে, একথাও ঠিক বটে; কিন্তু তিনি এই তিনখানা উপন্যাসের কোন খানাতেই ground বা ক্ষেত্র তৎকালোপযোগী করিতে পারেন নাই। Detail বা খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপারে তাঁহার আলেখ্যের ক্ষেত্র আধুনিকতা-দোষে দুষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে এদোষ পরিহার করিতে পারিতেন না তাহা নহে; তিনি উপন্যাসের purpose বা উদ্দেশ্য লইয়াই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ক্ষেত্রের প্রতি, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের প্রতি, আলেখ্যের আলো ও ছায়ার প্রতি তিনি তেমন দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। রাজসিংহ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কপালকুণ্ডলা যিনি লিখিয়াছেন, তিনি যে কারিকর মন্দ ছিলেন, এমন কথা বলা অসাধ্য। কিন্তু এই তিনখানা উপন্যাস লিখিবার সময়ে তিনি সিদ্ধান্ত

লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, চিত্রকলার প্রতি তেমন নজর রাখিতে পারেন নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই রাখেন নাই। এই তিনখানা উপন্যাসে যে সকল চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তাহাদের mentality বা মানস-উন্মেষ আধুনিকতা দোষে একটু দূষিত হইয়াছে। এদোষ কতকটা অপরিহার্য্য। কারণ, যাহাদের উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে এই তিনখানি উপন্যাস লিখিতে হইয়াছিল তাহারা যে আধুনিক স্ত্রী-পুরুষ। তাহাদের সংশয় ভঞ্জনের জন্য, সন্দেহ নিরসনের জন্যই তিনি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, ফলে তাঁহার অঙ্কিত নরনারীর চিত্রে আধুনিকতার (modernism) দোষ অপরিহার্য্য হইয়াছে। উদ্দেশ্যসমন্বিত উপন্যাস লিখিতে যাইলেই এ দোষ ঘটিবেই। বঙ্কিমচন্দ্রকে এজন্য দোষী করা যায় না। কিন্তু এক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী নির্দ্দোষ; তিনি সন্ন্যাসীর চিত্র অনেকটা নিখুঁত করিতে পারিয়াছেন। শুনিয়াছি তিনি ভাল সন্ন্যাসীর সংস্রবে আসিয়াছিলেন, তাঁহার আদর্শ ভাল ছিল। ফলে চিত্রও তাই পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর চিত্র তিনি তাঁহার প্রায় সকল উপন্যাসেই লিখিয়াছেন, এবং সেসকল চিত্রে সন্ন্যাসীর বৈশিষ্ট্য বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই কয়টা মোটা কথা গোড়ায় বলিয়া রাখিয়া, এই তিনখানি উপন্যাসের এক একখানি ধরিয়া আমার বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করিব।

নানাভাবে অনুশীলন তত্ত্বটা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এ অনুশীলন তত্ত্বটা কিন্তু খাঁটি ইউরোপের সামগ্রী। জর্ম্মণ পণ্ডিত ফিক্‌তের (Fichte) Individual and Communal Culture ব্যষ্টি এবং সংহতির অনুশীলনটাই, তিনি বাঙ্গালার গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া, বাঙ্গালীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আছে, আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তাহার কোন আদর্শের অনুকূল নহে। উহা যেন বিলাতের Lake Poets দিগের Susquehanna প্রদেশে Utopia সৃষ্টির জন্য আদর্শ,—প্রটেষ্ট্যান্ট Monkদিগের অনেকটা অনুরূপ।

বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা ও তাঁহার পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির।

গেরুয়াও থাকিবে এবং ঘরে পত্নীও থাকিবে, ব্রত উদ্‌যাপনের পরে সে পত্নীকে লইয়া ঘর করিবার আশা, তুষানলের মতন হৃদয়ে সদা জ্বলিতে থাকিবে, এমন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে ছিল না—হয় নাই। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাহারা শক্তি রাখিত বা শৈব বিবাহ করিত তাহারা গেরুয়াবসন পরিত না, রক্তাম্বর ধারণ করিত। গৌড়ীয় ভেকধারী বৈষ্ণবদের মধ্যে গৈরিকের প্রচলন নাই; উহারা গেরুয়া বা রক্তবস্ত্র পরিধান করিত না। এই সস্ত্রীক সন্ন্যাসীর দল গড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটু গোলে পড়িয়াছিলেন। সে গোল শান্তির জবরদস্তি, ভবানন্দের কল্যাণী-মোহ আদি উদ্ভট ব্যাপারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য মনীষা বুঝিয়াছিল যে, তেলে-জলে মিশ খায় না; পত্নীও থাকিবে, অথচ স্বামী ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসী সাজিবে; আর পত্নী জাগান দেওয়া আমটির মতন পাতায় ঢাকা হইয়া চিরজীবন কাটাইবে—অন্ততঃ যৌবনটা কাটাইয়া দিবে—এমন অঘটন ঘটাইতে হইলে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী উভয়ের পতন—ব্রতভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। গৃহানুরাগ বা domesticity বজায় রাখিয়া, বাঙ্গালিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এমন চিত্র পূর্ণাঙ্গ করা যায় না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের চরিত্র চিত্রণে গোটাকয়েক কলঙ্কলেখা স্পষ্ট রাখিয়াছেন। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, সমষ্টির কল্যাণ-সাধন করিতে হইলে ব্যষ্টি বা ব্যক্তিবিশেষের সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। যখন আনন্দমঠ রচিত হয়, তাহার পূর্ব্বে জর্ম্মণ জাতির সমন্বয় বা জলভরীণ হইতে National Cohesiveness বা জাতি-সংহতি লইয়া ইউরোপে এবং আমেরিকায় খুব আন্দোলন চলে। এই আন্দোলনের ফলে একটা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কার্ডিন্যাল নিউম্যান এপক্ষে অনেক কথা সে সময়ে কহিয়াছিলেন। আমার অনুমান হয় যে, আনন্দমঠের গড়নে নিউম্যানের ভাবের মসালা অনেকটা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লিখিয়া বাঙ্গালীকে এই কথাটা যেন ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, ইউরোপের ভোগপ্রচুর

শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীকে জাতির মঙ্গলকামী কর্ম্মী হইতে হইলে দেশীয়ভাবে ত্যাগী হইতে হইবে। তেমন কর্ম্মীকে সর্ব্বাগ্রে এমন পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইবে, যাহা দেখিলে বাঙ্গালার আপামর সাধারণে চিনিতে পারে, এবং চিনিয়া স্বেচ্ছায় তাহার অনুসরণ করিতে পারে। এইটুকু ইসারা করিয়া গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের জর্ম্মণ জাতির প্রচারিত সমাজতত্ব ইংরাজিশিক্ষিত বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া বলিতে হইতেছে বলিয়া আনন্দমঠের সন্ন্যাসী না পূরা তান্ত্রিক, না পূরা বৈষ্ণব। উহারা মানুষও মারিতেছে, আবার "ধীর সমীরে যমুনাতীরে" গান করিতেছে। উহাদের তান্ত্রিকী সাধনা নাই, বৈষ্ণবের জপযজ্ঞ এবং কীর্ত্তন আনন্দও নাই। উহারা পরোপকার করিতেছে —কোম্পানীর মাল লুটিয়া, কোম্পানীর নিরীহ সিপাহীকে খুন করিয়া উহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাকে ক্ষুধার অন্ন দিতেছে। পরোপকারের এমন উৎকট আদর্শ আমাদের শাস্ত্রে নাই, ধর্ম্মে নাই; বিশেষতঃ কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস ধর্ম্মে নাই। কারণ আনন্দমঠের সন্ন্যাসীর আদর্শের তলায় বিলাতী পেট্রিয়টিজম্ আছে, ইউরোপের outlawryর মোহন অংশটুকু অঙ্কিত আছে। এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কাঠামর (frame-work) উপর বঙ্কিমচন্দ্র এক অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন। এ কাব্যে বৈষ্ণবের মাধুরী আছে, তান্ত্রিক শাক্তের তেজস্বিতা আছে এবং আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের Idealismএর মোহ আছে। এই তিনের সমবায়ে মঠের গল্পটা খুব জাঁকাল হইয়াছে বটে; কিন্তু সিদ্ধান্ত বাক্য তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। হয় ত বা অন্য নানা কারণে তিনি ইচ্ছা করিয়া তাহা ফুটান নাই। তাই আনন্দমঠের অনেক কথা ঢাকা আছে; সেই কারণ উহার নাট্যাংশ ও উপদেশাংশ উভয়ে উভয়ের অনুবাদী (complementary) হয় নাই। আনন্দমঠে জীবানন্দ ও শান্তিই কেন্দ্রচরিত্র। এই দুই চরিত্র যে ভাবে ফুটান হইয়াছে, সে ভাবে চরিত্রোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত কথাগুলি আপনি ফুটিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে

সত্যানন্দকে আনিয়া সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে; অনেক কথা মহাপুরুষের উপর বরাত দিয়া রাখা হইয়াছে। আনন্দমঠের মহিমা চরিত্রোন্মেষে নহে, চিত্রাঙ্কনে নহে, উহার মহিমা "বন্দে মাতরম্" গানে এবং মাতৃ-মূর্ত্তি প্রদর্শনে। শক্তি-প্রতিমাকে কেমন ভাবে দেশাত্মবোধের প্রতীকে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিতে আনন্দমঠে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহাই আনন্দ-মঠের বিশিষ্টতা।

দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার culture বা অনু-শীলন তত্ত্বের সাহায্যে একটা মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবার ground বা চিত্রের ক্ষেত্র রচিবার প্রয়াসটা বেশ পরিস্ফুট। দেবীচৌধুরাণীর ক্ষেত্র অতি সুন্দর না হইলেও মনোহর বটে। দেবী-চৌধুরাণী যেন বৈষ্ণবের হাতের শক্তি-মূর্ত্তি—কমলা নহে, ভৈরবী নহে, কালীও নহে; অথচ তিনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব বৈষ্ণবঠাকু-রাণী। যখন শক্তি-মূর্ত্তি তখন পুরুষ সম্মূঢ়; ব্রজেশ্বর পিতৃশাসনে সম্মূঢ়, প্রফুল্লর রূপে সম্মূঢ়। এই পুরুষের তৃপ্তি-তুষ্টি সাগর বৌ, বিরক্তি ও বিধৃতি নয়ান বৌ এবং ঐশ্বর্য্য ও আকাঙ্ক্ষা প্রফুল্ল বা দেবীচৌধুরাণী। প্রফুল্লকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-শালিনী করিতে যাইয়া কবি গোলে পড়িয়াছেন। প্রফুল্লকে একরাত্রির জন্য স্বামিসঙ্গে সুখী করিয়া কবি সর্ব্বৈশ্বর্য্যের পথে একটা কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার পরিণাম দেবীরাণীর ব্রজেশ্বরের গৃহে আসিয়া বাসন মাজা—ঘর-সংসার দেখা। যেমন কর্ম্মী তেজস্বী ব্রাহ্মণ ডাকাতের হাত দিয়া কবি দেবীরাণীকে গড়িয়া তুলিলেন, সে গড়নের ফলে পুরুষ ব্রজেশ্বর সোনা হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু কবি প্রফুল্লের সংস্পর্শে ব্রজেশ্বরের মানবতার উন্মেষ-ভঙ্গী দেখান নাই। যেন প্রফুল্ল আসা-তেই নয়ান বৌয়ের ঝগড়া থামিল, সাগর বৌয়ের অভিমান দূর হইল, আর ব্রজেশ্বর যেন "নিত্য সর্ব্বগত স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" পুরুষের হিসাবে, প্রফুল্লের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া, সত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রফুল্ল,

সাগর ও নয়ান বৌ—এই তিন গুণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই তিনের সমাধান করিলেন প্রফুল্ল, সংসারে একটা negative সুখের বা স্বস্তির লহর তুলিলেন প্রফুল্ল, ফলভাগী হইল ব্রজেশ্বর। এই টুকুর জন্য প্রফুল্লকে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন, বিজ্ঞান সবই শিখিতে হইল, কুস্তী করিতে হইল, লাঠি খেলিতে হইল, নানা ভঙ্গীতে ত্যাগের মন্ত্র করিতে হইল, দেবীরাণীর দোকানদারী বসাইতে হইল, ডাকাতের দলের সর্দ্দার হইতে হইল! ভবানী পাঠকের গুরুগিরির পর্য্যাবসান হইল সাদামাঠা গৃহস্থের কুলাঙ্গনার ঘর-গৃহস্থলীর কার্য্যে—বাসনমাজায় ও সপত্নী বশীকরণে। আদিরসের কবি আদিরসটুকু ভুলিতে পারেন নাই, domesticityর লোভটুকু সাম্লাইতে পারেন নাই। এতটা শিক্ষার পরেও প্রফুল্ল বৈষ্ণবী হইতে পারিলেন না, তান্ত্রিক মতে শাক্ত ভৈরবী হইতেও পারেন নাই। ঝান্সীর রাণীর বা রাণী দুর্গা-বতীর বা বাঙ্গালার সোনা বিবীর এত শিক্ষা হয় নাই, তথাপি তাঁহারা শক্তিরূপিণী ছিলেন, অঘটন ঘটাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বহুগ্রামে অপূর্ব্ব শক্তিশালিনী ও সংযমপরায়ণা বহু ভৈরবী ও বৈষ্ণবী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের আদর্শও প্রফুল্লের পরিণতি অপেক্ষা অতি উচ্চ স্তরের। গীতার হিসাবে সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করাইয়া, নিষ্কাম ধর্ম্মের ছবি আঁকিলে ব্রজেশ্বরেও প্রফুল্লর স্বামি-বোধ থাকিবে না; ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিশালতায় মিশিয়া যাইবে। তাই প্রফুল্ল-চরিত্র একটা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়; উহাকে শাস্ত্রের মাপ-কাঠিতে কিংবা ইউরোপীয় দর্শনের মাপ-কাঠিতে মাপিলেও পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যদি ব্রজেশ্বরে শিবত্বের আরোপ করিয়া প্রফুল্লকে শক্তিরূপে খাড়া করিতেন, তাহা হইলে ব্রজেশ্বরের চিত্র অন্য প্রকারের হইত, প্রফুল্লও আরও একটু ফুটিত। অথবা যদি প্রফুল্লকে বৈষ্ণবী সাজাইতেন তাহা হইলে উহাতে হয় সুভদ্রার নহেত রুক্মিণীর ছায়া পড়িত। দুইয়ের কোনটাই প্রফুল্লে পরিস্ফুট হয় নাই। এত করিয়াও যখন প্রফুল্লের স্বামীর ঘর করিবার আকাঙ্ক্ষা ঘুচে

নাই, যখন সাগর বৌকে বজরায় ডাকিয়া রঙ্গভঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই, তখন প্রফুল্লে নিষ্কাম ধর্ম্মের, গীতাতত্ত্বের স্ফুরণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। অথচ গীতার সিদ্ধান্তসকলের ছড়াছড়ি দেবীচৌধুরাণীতে করা হইয়াছে। সাধক ভবানীপাঠকের আলেখ্যে কোন বিষম দোষ দেখি না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রজেশ্বরের মতন পিতৃ-ভক্ত বাঙ্গালী যুবক অনেক ছিল, ব্রজেশ্বরের জনকের মতন বিষয়ী বাঙ্গালী কর্ত্তাব্যক্তি অনেক দেখিয়াছি, সাগর বৌ, নয়ান বৌ যে দুই একটা দেখি নাই তাহা নহে; কিন্তু প্রফুল্ল-চরিত্র অপূর্ব্ব; উহা বাঙ্গালার নহে, অথচ বেশ বাঙ্গালীয়ানা মাখান। উহা বাঙ্গালীর ঘরে কখনও ছিল না, বাঙ্গালীর ঘরে কখনও হইবে না। যে উদ্ভটতা শান্তিতে আছে, সে উদ্ভটতা প্রফুল্লেও ফুটিয়াছে। কোনটা বাঙ্গালার নহে, ভারতবর্ষের নহে, অথচ কোনটাকেই বাঙ্গালিত্বের গণ্ডী হইতে বাহিরে রাখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের এই টুকুই কারিগরী—এই টুকুই শিল্প-নৈপুণ্য।

সীতারাম উপন্যাসে যেন দেবীচৌধুরাণীর obverse proposition solve বা কতকটা বিরোধী ভাবের ব্যঞ্জনা দেখান হইয়াছে। এখানে পুরুষ প্রকট; সীতারাম রায় কর্ম্মী ও তেজস্বী পুরুষ। তাঁহার তিন স্ত্রী—শ্রী, নন্দা এবং রমা। শ্রী যেন ঐশ্বর্য্য, নন্দা যেন হ্লাদিনী, রমা যেন স্ত্রী বা মোদিনী। রাজার রাণী যেমন হইতে হয়, ঘরণী-গৃহিণী যেমন হইতে হয়, নন্দা তেমনই। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমতী, স্বামীর গৌরবে গৌরবান্বিতা, স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষায় সদা নিরতা; বাঙ্গালার গৃহস্থ কুলাঙ্গনার এক দিকের একটা আদর্শ নন্দা। রমা যেন মোমের পুঁতুল, সোহাগের খুঁচি, যেন আদিরসের মঞ্জুষা; স্বামীর সোহাগে সদাই যেন গলিয়া পড়িতেছেন; স্বামীর মহত্ত্বে বা গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার শক্তি নাই, স্বামীকে লইয়া খেলা করিবার প্রবৃত্তি বেশ আছে। ফলে, রমা সদা ভীতা ও সঙ্কুচিতা; সে স্বামীকে পাইলে পুঁতুল খেলা করিতে ভালবাসে, স্বামীর রাজা-

গিরির, দেশাত্মবোধের কোন ধারও ধারে না। এমন চীনের পুঁতুল, মোমের খেলনা, রাজা-বাদসা ধনীর ঘরে অনেক পাওয়া যায়। ইহাতে অস্বাভাবিকতা নাই। কিন্তু শ্রী—সে কেমন নারী! প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবার আশঙ্কায় শ্রী স্বামীবর্জ্জিতা; সে বর্জ্জনকালে, কিশোর বয়সে তাহার কেমন শিক্ষাদীক্ষা হইয়াছিল তাহার কোন পরিচয় গ্রন্থকার দেন নাই। শ্রী ফুটিল গঙ্গারামের রক্ষা ব্যাপারে, ঋিদণ্ড বটশাখায় দাঁড়াইয়া লোক সমাহরণে ও উৎসাহ দানে শ্রী ফুটিয়া উঠিল—বিদ্যা-বিলাসের মত ভ্রাতা ও স্বামীর প্রাণ সংশয় বুঝিয়া একবার শ্রী বাঙ্গালীর মেয়ের মতন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর শ্রী একটা প্রহেলিকা; সন্ন্যাসিনী ভৈরবী বটে, কিন্তু জগন্নাথের রথের দড়ীর টানের মত তাহার হৃদয়ে স্বামী-ঘর করিবার সাধটুকু বেশ জাগিতেছে। অথচ যখন সীতারাম তাহার দ্বারস্থ, তাহার জন্ম পাগল, সে পাগলামীর ফলে রাজ্য যায়, স্বাধীনতা যায়, তখন শ্রী পাষাণী। এই পাষাণ ভাব-টাই সীতারামের পুরুষকারের তাসের ঘর শেষে ভাঙ্গিয়া দিল। শ্রীকে allegory বলিতে পারি না কারণ allegoryর হিসাবে শ্রীর চরিত্রোন্মেষ ঘটান হয় নাই। শ্রী একটা abstraction'ও নহে; কারণ অমন ভাবে abstraction ফুটিয়া উঠে না। সীতারাম হেন পুরুষ,—যে দেশের জন্য, জাতির জন্য পাগল, যে স্বীয় পুরুষকারের প্রভাবে অঘটন ঘটাইয়াছিল, যাহার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান মামুদাবাদ ও ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা,—তেমন একনিষ্ঠ সাধক এমন মোহে পড়িবে কেন? একনিষ্ঠার এমন পরি-ণাম হয় না। যাহার একনিষ্ঠা আছে, সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিলে, নিশ্চিন্ত না হইলে, তাহার মন অন্য দিকে যাইবে না। সীতরাম বিপদ্‌বেষ্টিত হইয়াও পতঙ্গের ন্যায় শ্রীর রূপে পুড়িয়া মরিল। শ্রীইবা এমন কোন দেশের ভৈরবী যে, ধর্ম্মরাজ্য ছারেখারে যাইতেছে দেখিয়াও টলিল না, সর্ব্বনাশ করিয়া তবে বাহির হইল! এমন allegory আমি বুঝিতে পারিলাম না। সাধনশাস্ত্রের মাপ-কাঠিতে ইহা বুঝি না, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের মাপকাঠি

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
(বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদরের মধ্যে একমাত্র পূর্ণবাবুই জীবিত আছেন।
ইনি "বঙ্গ-দর্শনের" কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন)

লইয়া ইহার পরিমাণ করিতে পারি না। তাহার পর গঙ্গারাম ও রমা—এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। গঙ্গারাম শ্রীর ভাই, সুতরাং শ্রীর সপত্নীর ভ্রাতৃস্থানীয়। গঙ্গারাম সীতারামের কৃপায় সব পাইয়াছিল; জীবন, পদ, ঐশ্বর্য্য, মান-সম্মান, তাহার ইহজীবনের সর্ব্বস্বই সীতারাম-দত্ত। সেই গঙ্গারাম নগরপাল, অবশ্যই বীর ও যোদ্ধা। নগরপালের হিসাবে, শ্রীর ভাইয়ের হিসাবে, রমা তাহাকে ডাকিতে পারে। তাই বলিয়া গঙ্গারামকে সহসা রমার রূপে পাগল করিয়া তুলিতে কোন আদিরসের কবি পারেন না, সাহসে কুলায় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে লাভ হইল কি? সিদ্ধান্তবিকাশের পক্ষে উহা সহায়তা করিল না, আদর্শ ফুটাইবার পক্ষে উহা কাজে লাগিল না, ক্ষেত্রের মার্জ্জনা পক্ষে উহার কোন প্রয়োজন নাই। গঙ্গারামের প্রেম এবং শ্রীর প্রতি সীতারামের মোহ যেন allegoryর হিসাবেও ঠিক খাপ খায় না। অথচ এই উপন্যাসের এই দুইটি ঘটনাই মহাপ্রাণ; গল্পটা এই দুইটি ঘটনার উপরই ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পের Tragedy এই দুই ঘটনা হইতেই পরদায় পরদায় খুলিয়াছে। ফলে, এই দুইটা ঘটনাকে বাদ দেওয়া যায় না, বর্জ্জন করা চলে না। কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে, গল্পের বনিয়াদের সহিত এই ঘটনা দুইটি ঠিক খাপ্ খায় না।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধের অনেক কথার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী চরিত্রের কোথায় কতটা ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। Artএর হিসাবে তিনখানা উপন্যাসে দোষ থাকিলেও, উপদেশের হিসাবে উহা পূর্ণাঙ্গ এবং নির্দ্দোষ। সে উপদেশ কথা সেই বুঝিবে, যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষার শেষ পরিণতি বুঝিয়াছে, যে ধর্ম্মতত্ত্বের সিদ্ধান্তসকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। শুশ্রূষু না হইলে তত্ত্ব কথা বুঝান যায় না। এই তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালীর সম্মুখে বহুকাল পড়িয়া আছে; উহাদের পর্য্যাপ্তভাবে অভিনয় হইয়াছে, বহু

লোকে উহা পাঠ করিয়াছে, কিন্তু উহাদের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা ঠিকমত হয় নাই। দেশ, কাল, পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমি বলিতে বাধ্য যে, উহাদের বিশ্লেষণের সময় ও শুভ অবসর এখনও দেখা দেয় নাই। যে ভাবে "বন্দে মাতরম্" মহাগীতি ফুটিয়াছিল সেই ভাবে এই তিনখানা উপন্যাসের তত্ত্বকথাও ফুটিয়া উঠিবে। সেটা বিধাতার কৃপা সাপেক্ষ। তাই আমি উহাদের নাম দিয়াছি —ত্রয়ী। ত্রয়ী ইষ্টের করুণা ছাড়া বুঝা যায় না। এই তিন খানিও বুঝিবার দিন কাল আছে, যোগ্য মানুষ আছে। এখন আমি বাহিরের মোটা কথা কয়টার উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারায়ণ
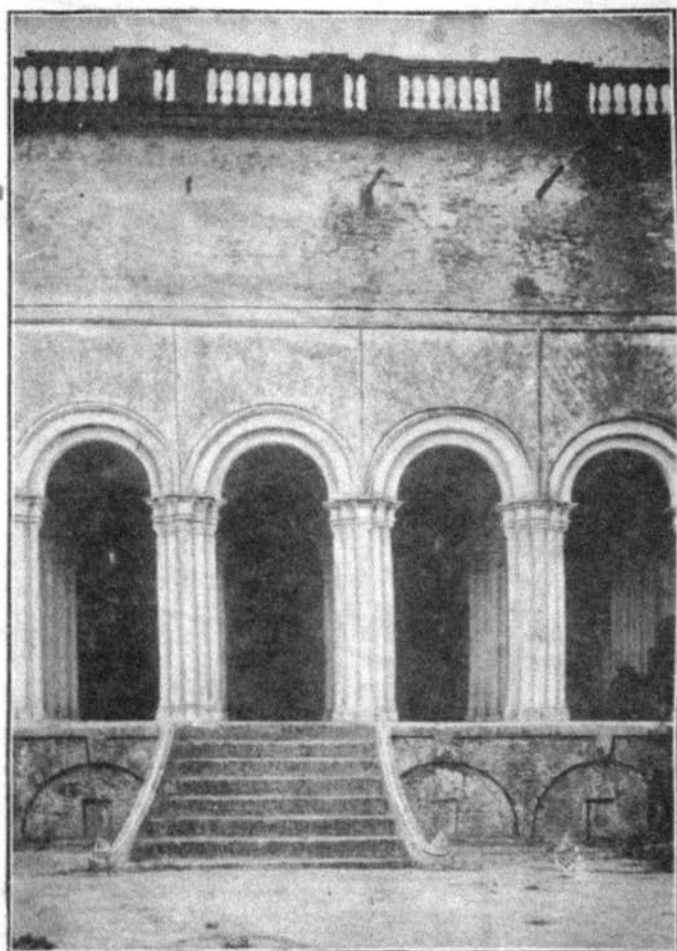
চট্টোপাধ্যায়-বাটীর অভ্যন্তর—ঠাকুরদালান।

BIJOYA PRESS

সেকালের স্মৃতি।—বাজে কথা

৪। বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমবাবু 'সৌখীন' ছিলেন। তাঁহার আশে পাশে সবই বেশ পরিপাটী, পরিচ্ছন্ন, সাজানো, গোছানো দেখিতাম। অগোছালো, বিশৃঙ্খল কিছু চোখে পড়িত না। বঙ্কিমবাবুর পরিচ্ছদে বিলাসিতা বা বাবুগিরি ছিল না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য ছিল। বাড়ী-তেও বঙ্কিমবাবুর পিরাণের বুকের বোতামের দু'একটা খোলা দেখি নাই। শেষ বয়সে বঙ্কিমবাবু দাড়ী গোঁফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন; প্রত্যহ কামাইতেন। পরামাণিকের অনুপস্থিতির পরিচয় বঙ্কিমবাবুর মুখে কখনও দেখিয়াছি, এমন ত মনে হয় না। সোনার চশমা-খানি ঝক্-ঝক্ চক্-চক্ করিত। খাপখানিও সেইরূপ। ঘরের আসবাব সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন। টেবিলে দোয়াত, কলম, কাগজপত্র, কেতাব প্রভৃতি যথাস্থানে সুরক্ষিত; কোথাও এক বিন্দু ধূলি নাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়া কলমটি মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। গুড়-গুড়িটি মাজা, নলটি ধোয়া-মোছা; মুরলী বড় কলিকায় 'তাওয়া' দিয়া উৎকৃষ্ট সুরভি মিঠে তামাক সাজিয়া দিত। বঙ্কিমবাবু বেশ মিঠাইয়া, জিরাইয়া, ধীরে ধীরে, তামাক টানিবার আয়েস ভোগ করিতেন।—বাড়ীতে ঢুকিলে, ঘরের চারি দিকে চাহিলে মনে হইত, কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নাই।

সাহিত্যেও বঙ্কিমবাবুর 'সৌখীনতা'র পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন। তাঁহার কল্পনায় সৌন্দর্য্য, রচনায় সৌন্দর্য্য, বাক্য-বিন্যাসে সৌন্দর্য্য, শব্দ-চয়নে সৌন্দর্য্য। তাঁহার উপন্যাসের অনেক পাত্রপাত্রীও সৌখীন, সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তাঁহার

আদর্শও সৌন্দর্য্য। তাঁহার অনেক ক্ষুদ্র সৃষ্টির 'রচনা-রীতি' খুব সৌখীন।

সেকালে "সাহিত্যে"র একটা জাঁকালো সংস্করণ বাহির হইত। খুব পুরু মসৃণ কাগজে উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা, বহুমূল্য গোলাপী মলাটের কাগজে মোড়া। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০৲ দশ টাকা। ইহা 'রাজসংস্করণ'। রাজসংস্করণ রাজাদের পাতে দিবার যোগ্য সংস্করণ, অথবা সংস্করণের রাজা, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা মনে আছে, কোনও রাজা ইহার গ্রাহক হন নাই। কোনও প্রজাও হন নাই। এক শত ছাপা হইত। এক জন 'গ্রাহক' হইয়াছিলেন। তিনি রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী ;—জমীদার, টাঙ্গাইলের কবি শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। পুরাতন হিসাবে ভূস্বামী রাজা। ইনি এখন 'রাজা'র ভাই-দাদা বটে।

যাক্। অবশিষ্ট নিরনব্বইখানি আমরা বাছিয়া বিলি করিতাম। একদিন সেই রাজসংস্করণের "সাহিত্য" লইয়া বঙ্কিমবাবুকে দিতে যাই। বঙ্কিমবাবু ভাল ছাপা পছন্দ করিতেন। "সাহিত্য"খানি হাতে করিয়া লইলেন; বলিলেন, "বাঃ, চমৎকার!" উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন; আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এত খরচ করিয়া সামলাইতে পারিবে কি?"

আমি বলিলাম, "এক শত এইরকম ছাপা হয়, সব নয়।"

"তাতেও ত অনেক খরচ পড়িবে। কে লইবে?"

"কেহ নয়। আমরা সখ করিয়া ছাপি। এক জন গ্রাহক হইয়াছেন!" প্রমথবাবুর নাম বলিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছাপা ভালবাসি। আমার বহিগুলি এখন ভাল করিয়া ছাপাইতেছি। বাঁধাইয়া দিতেছি। কাজেই দামও বাড়াইতে হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আমাদের দেশের লোক বেশী দাম দিয়া কিনিতে পারিবে কি? বোধ হয়, বিক্রী কমিয়া যাইবে।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তা হ'তে পারে। কিন্তু আমার সমস্ত বই ঐ রকম করিয়া ছাপিব।"

আমি বলিলাম, "দাম সস্তা হইলে সকলে পড়িতে পারিত। বড় বড় ইংরেজ লেখকদের বই কত সস্তায় পাওয়া যায়।"

"তা বটে। আমি তাও ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমার মনে হয়, এ দেশে এখনও cheap literatureএর সময় হয় নাই। আমার মনে হয়, উপন্যাসের মূল্য অধিক হইলে ক্ষতি নাই।"

আমি প্রকারান্তরে প্রতিবাদ করিবার জন্য বলিলাম, "সকলের সুবিধার জন্য আমরা 'সাহিত্যে'র বার্ষিক মূল্য দুই টাকাই রাখিয়াছি।"

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে আর একদিন বলিয়াছিলাম—'সাহিত্যে'র দাম তিন টাকা করিয়া দাও। যাহারা দুই টাকা দিতে পারে, তাহারা তিন টাকাও দিতে পারে। যাহারা তিন টাকা, দুই টাকা, কিছুই দিতে পারে না, তাহারা কিছুই কেনে না। "বঙ্গদর্শনে'র সময়েও দেখিয়াছি, 'প্রচারে'ও দেখিয়াছি;—যে শ্রেণীর লোক গ্রাহক হয়, দুই এক টাকায় তাহাদের আসে যায় না।"

"যাহারা খুব গরীব? তাহারা কি পড়িতে পাইবে না?"

"খুব গরীব, অথচ পড়িতে জানে, পড়িতে চায়, এমন লোকের সংখ্যা এখনও এ দেশে অত্যন্ত অল্প। আমাদের দেশে সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই; তাই শিক্ষিতের সংখ্যা বড় অল্প। cheap literatureএর এখনও সময় হয় নাই। ইহার অন্য কারণও আছে। সকল জিনিস সকলের হাতে দেওয়া উচিত নয়। সকল বই সাধারণে না পড়িলেও কোনও ক্ষতি নাই। কতকটা পড়া শুনা থাকিলে যে সব জিনিস পড়া চলে, খুব অল্পশিক্ষিতের পক্ষে সে সব বই পড়িলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। দেশের অবস্থার সঙ্গে cheap literatureএর সম্বন্ধ আছে।"

তার পর সাহিত্যখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "দিব্যি 'get-up' হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আমরা ত আর কিছু করিতে পারিব না। কাগজে, মলাটে, বাহারে যা হয়।—"

"কেন? তোমাদের কাগজ ত বেশ হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "আপনি যদি 'বঙ্গদর্শন' খুড়ীর কাগজে বটতলার ছাপাখানায় ছাপিয়া দিতেন, তাহা হইলেও ক্ষতি ছিল না। অমন কাগজ আর হইবে না। আমরা অমন লেখা কোথায় পাইব?"

মনে করিয়াছিলাম, বঙ্কিমবাবু ইহাতে সায় দিবেন; বলিবেন, "তা বটে।" কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমরা না পারিবে কেন? এখন যে সব কাগজ বাহির হইতেছে, 'বঙ্গদর্শনে'র যে সুবিধা ছিল, তাহাদের সে সুবিধা নাই। তখন বাঙ্গালায় অনেক জিনিস লেখা হয় নাই। প্রবন্ধ লেখা সহজ ছিল। যে বিষয়ে লোকে কিছু জানে না, সে বিষয়ে যৎ-সামান্য লিখিলেও চলিত, লোকে তাহাই পড়িত, সেইটুকুই শিখিত। এখন আর তাহা চলে না। এই তোমার 'সাহিত্যে'র কথাই ধর। উমেশ বটব্যালের মত original research করিয়া 'বঙ্গদর্শনে' কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই। বটব্যালের বৈদিক প্রবন্ধগুলি, নগেন গুপ্তর 'মৃত্যুর পরে'—উঁচু দরের লেখা। 'বঙ্গদর্শনে' এ রকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই।—তোমরা পারিবে না কেন? 'বঙ্গদর্শনে'র কাজ বঙ্গদর্শন করিয়াছে; তোমাদের কাজ তোমরা কর।"

বঙ্কিমবাবু শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "মৃত্যুর পরে"র বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিন চারিবার আমার নিকট উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। নগেনবাবুর styleএরও তিনি প্রশংসা করিতেন। "মৃত্যুর পরে" গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। পূজ্যপাদ বটব্যাল মহাশয়ের "বৈদিক প্রবন্ধাবলী"ও "বেদপ্রবেশিকা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ হয়, দুই-ই ইঁদুরে কাটিতেছে।

আমি বলিলাম, "আপনার লেখা? আপনার প্রবন্ধ, সমালোচনা,

উপন্যাস,—সে রকম আর কে লিখিবে? সে গৌরব ত আর কোনও মাসিকের ভাগ্যে ঘটিবে না। আপনি ত আর কোনও কাগজে লিখিবেন না।"

"আর লিখিয়া উঠিতে পারি না। তোমাদের কাগজখানির সুন্দর ছাপা, দেখিয়া লোভ হয়। লিখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আমি আমার কাগজের কথা বলি নাই; আমার সেই প্রথম দিনের হুকুম মনে আছে।"

বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি না বল,—আমি তোমার কথা ভাবি। তুমি ছেলেমানুষ, এত টাকা খরচ করিতেছ; 'বন্ধ করিয়া দাও' বলিতেও ইচ্ছা হয় না। অথচ তোমার লোকসান দেখিলেও কষ্ট হয়। অন্ততঃ খরচপত্রটা চলিয়া যায়, এমন কিছু করা যায় না?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "যায়। সে উপায় আপনার কাছে। আমার বলিবার উপায় নাই!"

বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমার লেখা? আমি লিখিলেই কি কাগজ চলিবে?—তা চলুক না চলুক, আমি যে তোমার কাগজে কিছু দিতে পারিতেছি না, তার কারণ আছে। অন্ততঃ চারিটি প্রবন্ধ না লিখিলে হয় না। তা পারিয়া উঠিতেছি না।"

আমি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলাম, "একটাই দিন না!"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "শুধু তোমাকে একটা দিলে ত চলিবে না। স্বর্ণকুমারী আসেন; আমার নাতীদের কত খেলনা দিয়া গিয়াছেন। আমি ত সব বুঝি। তাঁহার 'ভারতী' আছে। রবি আসেন; জান ত, 'প্রচারে'র সময় এক পালা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার 'সাধনা' আছে। তুমি আছ, তোমার 'সাহিত্য' আছে। তার পর আর এক আছেন,—আমার বেয়াই দামোদর বাবু।"

আমি বলিলাম, "তাঁহার 'প্রবাহ' ত নাই। তিনি কি আবার—"

"না; তিনি 'নব্য-ভারতে'র জন্য ধরিয়াছেন। সেদিন তাঁহাকে

বলিয়াছি—আমা দ্বারা হইয়া উঠিবে না।—এখন, তিনটি লিখিতে পারিলেও হয়। তা যে কবে পারিয়া উঠিব, তা ত বলিতে পারি না।"

এমন সময়ে মুরলী আসিয়া খবর দিল,—হারাণবাবু আসিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে লইয়া আসিতে বলিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "হারাণচন্দ্র কেন আসিয়াছেন, জান?—'বঙ্গবাসী'র যোগেনবাবু হারাণবাবুকে আর এক দিন পাঠাইয়াছিলেন। 'জন্মভূমি'র জন্য আমার উপন্যাস চান। পাঁচ শত টাকা দিতে চাহিয়াছেন।"

এমন সময়ে হারাণবাবুর প্রবেশ। হারাণবাবু—স্বনামধন্য, এখন রায় সাহেব হইয়াছেন। কোনও চন্দ্রকেই প্রদীপ জ্বালিয়া দেখাইতে হয় না! হারাণচন্দ্রের জন্য মশাল জ্বালিলে অভিমানী রায় সাহেব আমাকে ক্ষমা করিবেন না।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "বসুন হারাণবাবু।—আমি পারিয়া উঠিব না।"

হারাণবাবু একটু জিদ করিতে লাগিলেন, টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে, তাহারও আভাস দিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "না।" তার পর হারাণবাবুকে বলিলেন, "সাহিত্যের get-up দেখুন।"

হারাণবাবু বলিলেন, "ক'খানিই বা ছাপা হয়? 'জন্মভূমি' অনেক ছাপিতে হয়; 'জন্মভূমি'র ছাপাও মন্দ নয়।"

"আমি সে কথা বলিতেছি না।"

হাসিতে হাসিতে হারাণবাবু বলিলেন, "যোগেনবাবুকে কি বলিব?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "বলিবেন,—আমি পারিব না।" তার পর গড়গড়ায় নলটি লাগাইয়া দুই এক টান তামাক টানিয়া বলিলেন,—"ভক্তি প্রীতির জন্য যাহা করিতে পারিতেছি না, টাকার জন্য তাহা পারিয়া উঠিব কি?"

হারাণবাবু বলিলেন, "আমি আর এক দিন আসিব।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "কিন্তু আমাদ্বারা হইয়া উঠিবে না।"

আমি বঙ্কিমবাবুর সম্মুখে বসিয়া যে নূতন বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিলাম, তাঁহাকে ত আগে দেখি নাই, চিনিতে পারি নাই! আমার মানস-পটে তাঁহার অন্য মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কল্পনা-নয়নে সেই বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি দেখিয়া মনে হইল,—

"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!"

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা

সেকালের পল্লিগ্রামমাত্রেই পাঠশালা থাকিত। আমাদের গ্রামেও পাঠশালা ছিল, আমাদের বাটীর সন্নিকটে একটি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নহে। হুগলি কালেজে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে একজন private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বালক, উপনয়ন হয় নাই। এই অবস্থায় তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ পাঠশালায় উপস্থিত হইতেন। গুরুমহাশয় কায়স্থ সন্তান, বড় রাসভারি লোক, ছাত্রেরা তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। যখন তিনি ভূমিতে বেত আছড়াইয়া, "লেখ্ লেখ্ শূয়াররা" বলিয়া চীৎকার করিতেন, তখন ছাত্রেরা থরহরি কাঁপিতে থাকিত। বালক বঙ্কিম, এক একদিন বৈকালে এই পাঠশালায় উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনাস্বরূপ গুরুমহাশয় হাসিয়া তাঁহার হস্তে বেতগাছটি তুলিয়া দিতেন। বালক বঙ্কিম বেত লইয়া কোন কোন ছাত্রের নিকট গিয়া তাহার পরীক্ষা করিতেন। ছাত্রেরা কেহ বা তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ, কেহ সমবয়স্ক, কেহ বা বয়োকনিষ্ঠ। অধিকাংশ ছাত্র তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে দুই তিনজন বালকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর বেত দুলাইয়া বলিতেন, "মারি' মারি', আজ তোমরা কেন আমাদের বাড়ী তাস খেলতে যাও নাই?" বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে খেলার মধ্যে কেবল তাস খেলিতেন, দুই প্রহরের সময়ে ঐ কয়জন বালকের সহিত কোন কোনদিন তাস খেলিতেন। বালকদিগের দৌড়াদৌড়ি এবং অন্যান্য খেলা—যাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন করে—তাহা খেলিতেন না। খেলিতে ভাল লাগিত না, সেই জন্য, দুর্ব্বল ও ক্ষীণদেহ ছিলেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে বালকদিগের পরীক্ষা করাতে তাহা-

দের উৎসাহ হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাল্যকালে দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতেছিল, উহার প্রভাবে অন্যান্য বালকেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত, সকলে তাঁহার নিকট ঘেঁসিতে পারিত না। তিনি কাহা:ক ভাল বলিলে, তাহার আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত। স্কুলে, কালেজে, তাঁহার সমধ্যায়ীদিগের উপরও ঐরূপ প্রভাব ছিল, ইহা তাঁহার অসামান্য প্রতিভারই মহিমা। লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদান করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যখন যৌবনে একজন বিখ্যাত বাঙ্গলা লেখক হইলেন, তখন অনেকগুলি সুশিক্ষিত যুবককে উৎসাহ দিয়া লেখক করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক একজন বিখ্যাত লেখক হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র না জন্মাইলে, রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কখনও বাঙ্গলা ভাষার লেখক হইতেন না, চিরকাল ইংরাজি লেখক থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্ররোচনায় ও অনুপ্রাণনে তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

পৌষ কি মাঘ মাসে একদিন সূর্য্যোদয়ে পাঠশালায় যাইয়া গুরু-মহাশয়-দত্ত বেত লইয়া, বালক বঙ্কিম, কোন একটি বালকের নিকট বসিয়া তাহার লেখাপড়া দেখিতেছিলেন, এমত সময় একটা গোল উঠিল যে, গঙ্গার ঘাটে গোরার বহর লাগিয়াছে। এই সংবাদে চারিদিকের লোকজন, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি বালক, ছুটাছুটি করিয়া পলাইতে লাগিল। পাঠশালার ছাত্রগণ পাত্তাড়ি ফেলিয়া পলাইল। গুরুমহাশয় চটিজুতা পায়ে কট্ কট্ শব্দে পলাইলেন। এক ব্যক্তি এক বাজরা বেগুণ লইয়া নৈহাটীর বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, সে উহা আমাদের ঠাকুরবাড়ীর দরজার নিকটে ফেলিয়া পলাইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে রাস্তা ঘাট নির্জ্জন হইল। সকল বাটীর দরজা বন্ধ হইল, কেবল বালক বঙ্কিমের জন্য আমাদের বাড়ীর দরজা খোলা রহিল, তিনি গুরুমহাশয়প্রদত্ত বেত হাতে করিয়া আমাদের বাটীর দরজার নিকট রাস্তার ধারে দাঁড়াইলেন, সুতরাং আমাদের যত লোকজন ছিল, তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

পিতৃদেব তখন তাঁহার কর্ম্মস্থলে, অগ্রজদ্বয়ও তাঁহার নিকটে। গ্রামে গোরার বহর লাগিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা বিপদ ভাবিয়া পলায় কেন! সেকালে পশ্চিমাঞ্চল হইতে গোরারা কুচ করিয়া কলিকাতায় আসিত, কিন্তু পীড়িত গোরারা নৌকাযোগে আসিত। যে স্থানে সূর্য্যোদয় হইত, সেই স্থানে ঐ সকল গোরা প্রাতঃক্রিয়ার জন্য ডাঙ্গায় উঠিত, এবং গ্রামে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকারে উৎপাত করিত। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার গোরারা আমাদের গ্রামে নামিয়া ঐরূপ অত্যাচার করিয়াছিল। সেই অবধি গোরার বহর শুনিলে আমাদের গ্রামের লোকের হৃৎকম্প হইত। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুমহাশয়-দত্ত বেত্রহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন, এমত সময়ে একদল গোরা আসিতেছে দেখা গেল। তাহারা আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতে লাগিল, একজন বেতটি লইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে দলে দলে গোরা আসিতে লাগিল। বালক বঙ্কিম স্থিরভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাহারা ফিরিয়া গেল, বহর ছাড়িয়া দিল, গ্রাম আবার সজীব হইল।

কথাটা অতি সামান্য বটে, কিন্তু যে গ্রামের লোকেরা গোরার ভয়ে পলাইল, সকল দরজা বন্ধ হইল, বালক বঙ্কিম সেই গ্রামেই প্রতিপালিত, আকাশ হইতে পড়েন নাই। তিনি নির্ভয়ে বেত্রহস্তে গোরার সম্মুখে দাঁড়ান কেন, এই তেজটুকু বালকের পক্ষে অসামান্য বোধ হওয়াতেই এই স্থলে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। তিনি নিজেই চন্দ্রশেখরের এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "বাঙ্গালীর ছেলে মাত্রেই জুজুর নামে ভয় পায়, কিন্তু এক একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে জুজু দেখ্‌তে চায়।"

বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই ষাঁড়গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন, মই দ্বারা ছাদে উঠিতে পারিতেন না, সাঁতার জানিতেন না, একজন ভাল Executive Officer ছিলেন, তথাপি কখনও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না। ১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি পিতৃ-দত্ত

একটি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতাম। তিনি পূজার ছুটীতে কর্ম্মস্থল হইতে বাড়ী আসিয়া, উহা জানিতে পারিয়া ঘোড়াটি বিক্রয় করাই-লেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইনিই বাল্যকালে একদিন ডাকাতদের ভয় করেন নাই; কৈশোরে নদীবক্ষে ঝড় তুফানের ভয় করিতেন না, আর যৌবনে গুলিভরা পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া একজন সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স দশ কি এগার বৎসর, তখন একদিন সংবাদ আসিল যে, এক দল ডাকাত আমাদের বাটীতে ডাকাতি করিবে। পিতৃদেব তখন বাটী ছিলেন না, জেঠামহাশয়, খুড়ামহাশয়, পিসেমহাশয় প্রভৃতি মুরুব্বিগণ বন্দোবস্ত করিলেন যে স্ত্রীলোকেরা ও আমরা চার ভ্রাতা কয়েক রাত্রের জন্য প্রতিবাসীর গৃহে বাস করিব। ইহা শুনিবামাত্র বালক বঙ্কিম বাঁকিয়া বসিলেন, কুঞ্চিত কেশরাশি দুলাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তাহা কখনই হইতে পারে না, বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাইব না।" পিসেমহাশয় বলিলেন, "তবে ডাকাত আসিয়া সকলকে কাটিয়া যাক্।" বঙ্কিম বলিলেন, "কেন কেটে যাবে? আমাদের বাড়ীতে ত অনেক লোক আছে, আর গ্রামের তেওর বাগ্‌দি, যাহারা এক একজন লাঠিয়াল, ও বোম্বেটেগিরি করে, তাহাদের নিযুক্ত করুন, সাধ্য কি যে ডাকাতরা আমাদের কেটে যায়।" তাঁহার অগ্রজদ্বয়েরও ঐ মতে মত হও-য়াতে, বালক বঙ্কিমেরই পরামর্শ মতে কার্য্য হইল। কয় রাত্রি ধরিয়া অনেক লোক আমাদের বাড়ী পাহারা দিত। ডাকাত আসিয়া ফিরিয়া গেল। ঐ দিন হইতে গুরুজনেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে "বাঁকা" বলিয়া ডাকিত।

আমাদের গ্রামের আড় পারে হুগলি কালেজ, প্রায় সাত আট বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নৌকা চড়িয়া ঐ কালেজে যাইতেন। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই এক এক দিন ছুটীর সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইত, বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন্ রে, নৌকা ছাড়্‌বি?"

মাঝি নৈহাটীর পাটনী, কখন 'না' বলিত না, নৌকা খুলিয়া দিত। কোন কোন দিন ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে নৌকা ঘাটে গিয়া পৌঁছিত, আর কোন কোন দিন মাঝ গঙ্গায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে কাল মেঘ দিগন্ত অন্ধকার করিত। নদীর জল কাল হইত। অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রবল বেগে ঝড় উঠিত। ভীষণ তরঙ্গসকলের মাথাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেনার রাশিতে যেন নদীর বক্ষে তূলার মাড় ভাসিত। যাঁহারা নদী-বক্ষে ঝড়ে পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি ভয়ানক দৃশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র একদৃষ্টে ইহাই দেখিতেন। যিনি ষাঁড়গরু দেখিয়া ভয় পাইতেন তিনি প্রকৃতির এই সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি অজ্ঞান হইয়া দেখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কালেজ পরিত্যাগ করিবার তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে, আমি ঐ কালেজে ভর্ত্তি হই, সুতরাং আমাকেও মধ্যে মধ্যে এই বিপদে পড়িতে হইত।

বাইশ তেইশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই সময়ে একজন নীলকর সাহেব, হাতীর শুঁড়ে মশাল বাঁধিয়া একখানি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তখন বেঙ্গল পুলিসের সৃষ্টি হয় নাই, ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে পুলিস কাজ করিত। দারগাগণ ঐ সাহেবটিকে কোন মতে ধরিতে পারিল না, কেন না, তাঁহার নিকট সর্ব্বদা গুলিভরা পিস্তল থাকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, তাহার পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন। সাহেবটি British-born subject, সুতরাং হাইকোর্ট সোপরদ্দ হইয়াছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রকে ঐ আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল, কেন না, তিনি উহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচরিত্রের এইরূপ বিচিত্র অসামঞ্জস্য মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হইত।

এই সঙ্গে একটা রহস্যের কথা মনে পড়িল, উহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক দিবস এরূপ কুয়াসা চারিদিক ব্যাপিয়াছিল যে, কোলের মানুষ দেখা যায় নাই। আমার জীবনে কখনও

ঐরূপ কুয়াসা দেখি নাই, কেন না, উহা প্রায় ১০।১১টা অবধি ছিল। আমরা সাড়ে নয়টার সময় নৌকায় উঠিলাম। মাঝি নৌকা ছাড়িতে বিশেষ আপত্তি করিল, বলিল, দিক্ ঠিক করিতে পারিব না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা শুনিলেন না, নৌকা ছাড়িতে হুকুম দিলেন। তখন ভাটা, নৌকা ক্রমাগত চলিতে লাগিল। আমাদের নৌকা দশ পনর মিনিটে কলেজ-ঘাটে পৌঁছিত, কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা হইল, নৌকা চলিতেছে, কিন্তু কোথায় কলেজের ঘাট! নৌকা কেবল চলিতেছে, চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস্ রে?" মাঝি বলল, "আজ্ঞে, তা' জানি না।" "সে কি রে?" "আজ্ঞে, বোধ হয় ভাটার স্রোতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি।" মাঝি হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে, নৌকা ক্রমাগত স্রোতে ভাসিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল হাসিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে নৌকা আপনা-আপনি এক স্থানে তীরলগ্ন হইল। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোন জায়গা?" মাঝি বলিল, "বুঝি, মূলাযোড়।"

কপালকুণ্ডলা গল্পটি যে কুজ্ঝটিকায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এই দিনের ঘটনাবলম্বনে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে এবং কৈশোরে গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু যে সে লোকের নিকট নহে, কিম্বা যা' তা' গল্প নহে—সেকালের লোকের নিকট, সেকালের গল্প। বঙ্কিমচন্দ্রের দুই একখানি উপন্যাস কোন কোন ঘটনা অথবা কোন কোন গল্প অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। গত চৈত্র মাসের ভারতীতে "বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধু" প্রবন্ধে*

---

* যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়া মহকুমাতে ছিলেন, (এক্ষণে উহাকে কাঁথি মহকুমা বলে,) তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্‌লায় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছুদূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বন

কি ঘটনা অবলম্বনে কপালকুণ্ডলা রচিত হইয়াছিল তাহা লিখিয়াছি। এই প্রবন্ধে আরও দুই একখানির কথা লিখিব। আমাদের খুল্ল-পিতামহ এক শত আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি আমার পিতামহের মধ্যম ভ্রাতা, তাঁহাকে আমরা মেজঠাকুরদা

জঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থান হইতে খুলনা মহকুমায় (খুলনা তখন জেলা ছিল না) বদলি হন। ঐ সময়ে তিন চারি দিন বাটীতে অবস্থিতিকালে দীনবন্ধু আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিলেন, যথা—

"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যান্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিতা হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ-সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?" যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে এই প্রশ্ন করেন, তখন সেইস্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম। সঞ্জীবচন্দ্র বড় ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে মেয়েটা চোর হইবে; বন জঙ্গলে ভাল দ্রব্যাদি খাইতে পাইত না, সমাজে আসিয়া ভাল খাদ্য দ্রব্যাদি দেখিয়া বড় লোভী হইবে; দরিদ্র ঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের ঘরের চুরি করিয়া খাইবে, অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পরিবে।" পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদি হইলে, স্বামী পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে, সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।" ভাবগতিকে বুঝিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের একথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না—ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক-প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতটবিহারিণী, বনচারিণী, সৃষ্টি ছাড়া এক অপূর্ব্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তিরূপে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা শুনিতাম তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্তর্গত; উহা প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসান কালের কথা। ইনি গল্প করিতে ভালবাসিতেন ও গল্প করিতে জানিতেন। আধুনিক কোনও কোনও বিদেশী গল্প-লেখকেরা যেমন নায়ককে মিষ্টার এবং নায়িকাকে মিস্ লিখিয়া থাকেন, এই বর্ষীয়ান্ তাঁহার নায়ককে মির্জ্জা ও নায়িকাকে বিবী বলিতেন। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়-মান্দারণের ঘটনা শুনিয়াছিলেন; যদিও ঐ ঘটনা আকবর শাহা বাদসাহের সময় ঘটিয়াছিল তথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদসাহের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম, জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তিরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজঠাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন এবং মান্দারণের জমীদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমীদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুতকুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়াছিলেন, তাহার কয়েক বৎসর পরে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল। সরকারী কার্য্যোপলক্ষ্যে সঞ্জীবচন্দ্র কিছুকাল জাহানাবাদে ছিলেন। তিনিও ঐ ঘটনাটি সেখানে শুনিয়া আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন। তখন বোধ হয় দুর্গেশ-নন্দিনী প্রকাশিত হইয়াছিল।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের 'মতিবিবী' একটা গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত হয়। কোন দরিদ্র গৃহস্থের বধূ যৌবনারম্ভে কুলত্যাগিনী হইয়া কোন ধনাঢ্য যুবার রক্ষিতা হয়। প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পরে হঠাৎ

একদিন তাহার স্বামীকে দেখিল, দেখিয়া তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, সে কান্না আর থামিল না। কিছুদিন পরে প্রভুর অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তাহার যাহা কিছু সঞ্চিত ধন ছিল তাহা লইয়া স্বামীদর্শন আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের গ্রামে আসিয়া বাস করিল। এমত স্থানে বাসা লইল যাহাতে প্রতিদিন স্বামীকে দেখিতে পায়, প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিত আর কাঁদিত। এইরূপ দিবানিশি কাঁদিত। কুল-ত্যাগিনী হইলেও তাহার প্রতিবেশিনীগণ তাহার দুঃখ শুনিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিত। এইরূপে কিছুদিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এই চির-অভাগিনীর যৌবনেই জীবনান্ত হইল।

ইহার চরিত্রের সঙ্গে মতিবিবীর কোন সাদৃশ্য নাই বটে, কিন্তু ঘটনার সাদৃশ্য আছে।

বর্ষীয়ান্ খুল্লপিতামহের নিকট আমরা কয় ভ্রাতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা প্রথম শুনি। ইঁহার গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যেরূপে ঐ সময়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছিলেন তাহা আমার বোধ হয় একজন লেখকেও পারিত কিনা সন্দেহ। সেকালের লোক 'ফসল', 'অজন্মা', এই সকল কথা সর্ব্বদা আন্দোলন করিতে ভাল-বাসিত। মেজঠাকুরদা প্রথমে ফসলের কথা তুলিলেন। পরে কি প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল তাহা বিবৃত করিলেন। তিন চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে অজন্মা হইল, আর ঐ বৎসর (১১৭৬ সালে) ফসল হইল না; এই কয়বৎসর অজন্মার ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকদের আহার বন্ধ হইল, পরে মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থের, পরে ধনবানদেরও আহার বন্ধ হইল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের কাহারও কাহারও লক্ষ লক্ষ টাকা পোতা থাকিত, (সেকালে এইরূপে টাকা সঞ্চিত থাকিত), তবুও তাহারা অনাহারে মরিতে লাগিল, কেননা টাকা খাইতে পারে না, টাকাতে যে ধানচাল কিনিবে, তাহা দেশে নাই। এই-রূপ অবস্থাতে বঙ্গে নানাপ্রকার পীড়ার আবির্ভাব হইল, অবশেষে
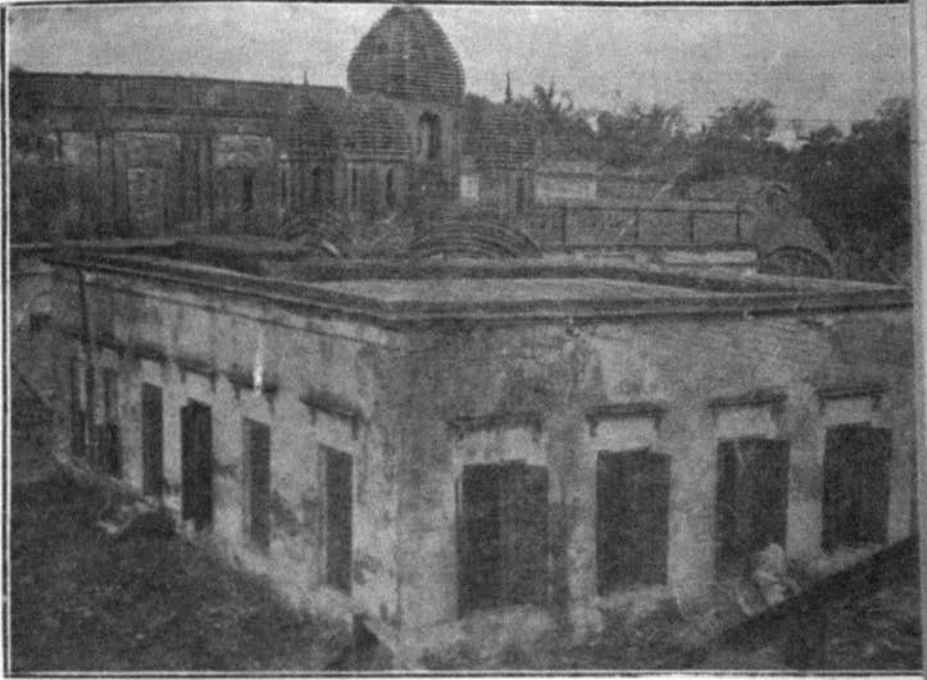
বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা—দক্ষিণ-পশ্চিমে রেলওয়ে পুলের উপর হইতে ।

যে সিঁড়ির উপর একজন লোক বসিয়া আছে, তাহার ঠিক নিম্নেই বঙ্কিমবাবুর একটী ছোট ফুলবাগান ছিল। ইহার চিহ্ন মাত্রও নাই। এই জমিটুকু এখন রেলওয়ে অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ঐ সিঁড়ির উপরে ডানদিকে ঘর এবং বামদিকে একটি ঘর। ডানদিকের ঘরটি তে বঙ্কিমবাবু একা বসিয়া লেখা পড়া করিতেন, বামদিকের ঘ দিনের বেলায় শুইতেন।—৫১৬ পৃষ্ঠা।

BIJOYA PRES

চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল। যাহাদের ঘরে টাকা পোতা ছিল, তাহারাও অন্নাভাবে চোর ডাকাত হইল। এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অগ্রজের উহা মনে ছিল, কেননা ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধ হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই, কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে "আনন্দমঠ" লিখিলেন। "বন্দে মাতরম্" গীতটি উহার বহুদিন পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই গীতটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ভবিষ্যৎ-বাক্য আছে। কয়েক বৎসর হইল শ্রীমান্ ললিতচন্দ্র মিত্র "সাহিত্যে" উহার সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখিয়াছিলেন বটে, তথাপি আমার যতটুকু স্মরণ আছে আমিও লিখিলাম। বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে দুই এক পাত matter কম পড়িলে পণ্ডিতমহাশয় আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা ঐ দিনেই লিখিয়া দিতেন। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে দুই একটি 'লোক-রহস্যে' প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশিত হয় নাই। "বন্দে মাতরম্" গীতটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিতমহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় একপাত matter কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা আজই পাবে।" একখানা কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল, পণ্ডিতমহাশয়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল, বোধ হয় উহা পাঠও করিয়াছিলেন, কাগজখানিতে "বন্দে মাতরম্" গীতটি লেখা ছিল। পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখা আছে,—উহা মন্দ নয় ত —ঐটা দিন না কেন।" সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, "উহা ভাল কি মন্দ এখন তুমি বুঝিতে পারবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে— আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।" এই গীতটির একটা সুর বসাইয়া উহার গাওনা হইত। একজন

গায়ক প্রথমে উহা গাহিয়াছিলেন। বহুকাল পরে বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় কোরাসে গাহিবার জন্য মিশ্র সুর বসাইয়াছিলেন, পরে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী আর একটি সুর বসাইয়াছিলেন। বেহাগ সুরে ভাল লাগিলে লাগিতে পারে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।

"বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ।" আজ "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাই আমার মনে পড়িতেছে। বৎসরের হিসাবে সে ত সেদিনের কথা—এখনও দশ বৎসর হয় নাই—কাল-সমুদ্রের একটি তরঙ্গও উঠিয়া মিলায় নাই। কিন্তু তাহার পর যেন "লাখ লাখ যুগ" চলিয়া গিয়াছে। যেদিন বাঙ্গালার ঘাটে, বাটে, তটে, মাঠে "বন্দেমাতরম্" গীত শুনা যাইত। পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একটি গীতে বাঙ্গালী, কেবল বাঙ্গালী নহে, সমগ্র ভারতের অধিবাসীরা, মা'র স্বরূপ দেখিয়াছিল। সেই, অবজ্ঞাত না হউক, অল্পপরিচিত গান পবন-সহায় দাবানলের মত দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেদিন আর আজ—ইহার মধ্যে কত যুগ বহিয়া গিয়াছে! সেদিন জড়ত্বশাপমুক্ত বাঙ্গা-লীর জাতীয় জীবনে যে উৎসাহ, যে উদ্যম, যে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস, যে জাতীয়-জীবন-গঠন-চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সেসব কি কেবল বিদ্যুতেরই মত বাঙ্গালীর অদৃষ্টাকাশে দেখা দিয়া অন্ধকার ঘনীভূত করিয়া গিয়াছে? সে ভাব কি উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণতি লাভ করিয়া উৎপীড়নে নিঃশেষ হইয়াছে? আজ আমার সেইদিনের কথাই মনে পড়িতেছে। তখন সমগ্র বঙ্গ "বন্দেমাতরম" গানে মুখরিত। "বন্দেমাতরম সম্প্রদায়ে"র উদাত্তস্বর হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণবের কীর্ত্তনের সুর পর্য্যন্ত কত সুরে কত জন এই গান গাহিতেছে! তখন ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়া স্বধর্ম্মত্যাগী কর্ম্মযোগী ব্রহ্মবান্ধব স্বজাতিকে সরল ভাবে তাঁহার জাতীয় ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনাইতেছেন—'সন্ধ্যা' তাঁহার প্রচারবেদী; আর বিদেশী শিক্ষার মুকুটময়ূখে স্বদেশী ভাবের স্বরূপ নির্ণীত করিয়া ধ্যানযোগী অরবিন্দ ইংরাজী-শিক্ষিত স্বদেশবাসীকে সে ভাব বুঝাইতেছেন—'বন্দেমাতরম' তাঁহার বক্তৃতামণ্ডপ। ব্রহ্মবান্ধব

বঙ্কিম-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে 'বন্দেমাতরম' পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার কথা হইল। স্থির হইল, একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা বিবৃত হইবে—সে প্রবন্ধ আমি লিখিব; আর একটি প্রবন্ধ লিখিবেন—অরবিন্দ। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন সভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে "বন্দেমাতরম" মন্ত্রের ঋষি বলিয়াছিলেন। সে কথা আমি অরবিন্দকে বলিয়াছিলাম। অরবিন্দ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার নাম—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। সংবাদপত্রে অনেক সময় সংরক্ষণযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সংবাদপত্র প্রায় কেহ রাখে না—রাখিতে পারে না। আবার 'বন্দেমাতরম' যাঁহারা রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনেকে সকারণ বা অকারণ ভয় হেতু তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। তাই আজ এতদিন পরে আবার সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বুঝাইতে লেখনী ধরিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি। তাঁহার ঋষিত্ব কিসে?

অনেকে এই প্রাচীন জাতির প্রনষ্ট গৌরবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, বর্ত্তমানকালে এই অধঃপতিত জাতির মধ্যে আর অমানুষ শক্তিশালী চিন্তার ও সভ্যতার নিয়ন্তা, ঋষির আবির্ভাব সম্ভব নহে। তাঁহাদের এ বিশ্বাস ভ্রান্ত—এ আক্ষেপ ভিত্তিহীন। যে দেশ সনাতন সে দেশের, যে জাতি সনাতন সে জাতির, আর যে ধর্ম্ম সনাতন সে ধর্ম্মের শক্তি, জ্যোতিঃ ও পূতপ্রভাব কিছুকালের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইতে পারে, কিন্তু চিরতরে অন্তর্হিত, অস্তমিত, অদৃশ্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষ বহু বীরের, বহু ঋষির ও বহু সাধু পুরুষের আবির্ভাবে পবিত্র হইয়াছে; ভারতবর্ষ তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র—লীলাভূমি। এই দেশেই তাঁহাদের আবির্ভাব স্বাভাবিক, যুগে যুগে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে "বন্দেমাতরম" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষিত্বে কে সন্দেহ করিতে পারে?

ঋষিতে ও সাধুতে প্রভেদ স্বপ্রকাশ। ঋষির জীবনে অসাধারণ

পূতাচার বা চরিত্রে আদর্শ-সৌন্দর্য্য না-ও লক্ষিত হইতে পারে। তাঁহার গৌরব তাঁহার জীবনে নহে; পরন্তু তিনি যে ভাব অভিব্যক্ত করেন তাহার সেই অভিব্যক্তিতে। কোন জাতিকে বা সমগ্র মানব-সমাজকে যে কথা জানাইতে হয়—ভগবান তাহা ঋষিমুখে ব্যক্ত করান। মানবকে যদি কোন অতিপ্রাকৃত দৃশ্য দেখাইতে হয়, তবে ঈশ্বরানুগৃহীত ঋষির নয়নে সে দৃশ্য প্রতিভাত হয়। তিনি তাহা দেখিয়া জগতে সে সংবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার কথায় অবিশ্বাসী বিশ্বাস না করিয়া পারে না, সংশয়ান্দোলিত হৃদয় স্থির হয়, সন্দেহের অন্ধকার দূর হয়। তাই জগতে অঘটন সংঘটিত হয়। যে কথা ব্যক্ত করাই তাঁহার বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য, সেই কথাই তাঁহার মন্ত্র, —তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি।

আজ বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সমগ্রদেশে সম্পূজিত কেন? তিনি আমাদিগকে কোন্ মন্ত্র দিয়াছেন—কোন্‌রূপ দেখাইয়াছেন? তিনি কবি, তিনি সাহিত্যক, তিনি কল্পনালোকে কমনীয় মূর্ত্তির রচনায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু কবি, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক বলিয়া তাঁহার গৌরব যত অধিকই হউক না কেন, তাহা তাঁহারই ঋষিত্ব-গৌরবের নিকট ম্লান— "শুষ্ক বদরীর মত তুচ্ছ"। সাহিত্য-সমালোচক শিল্পের মানদণ্ডে মাপিয়া তাঁহার 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতির স্থান, 'দেবীচৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রভৃতির স্থান অপেক্ষা উচ্চে নির্দ্দিষ্ট করিবেন। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'দির বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক ও কবি, আর 'দেবীচৌধুরাণী' প্রভৃতির বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি ও জাতিসংগঠক। কবিকীর্ত্তি দুর্ল্লভ—ঋষিকীর্ত্তি কল্পান্তস্থায়িনী।

কবি ও সাহিত্যিকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতেও জাতীয় কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছিল। সত্য বটে তাঁহার সাহিত্যিক কার্য্যের ফল মুখ্যভাবে বাঙ্গালীই সম্ভোগ করিয়াছিল; কিন্তু গৌণভাবে জগতের অন্যান্য প্রদেশও তাহাতে বঞ্চিত হয় নাই।

কারণ, জাতীয় জীবন-গঠনে বাঙ্গালাই ভারতের পথপ্রদর্শক। কোন জাতি যখন তাহার স্বতন্ত্র জাতীয় স্বত্তা অনুভব করে, তখন তাহার হৃদয় যে নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায়, নূতন কল্পনায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, সে-সকলের প্রকাশোপযোগী ভাষা না পাইলে সে জাতির উন্নতির গতি প্রহত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে সেইরূপ ভাষা দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম দানের মূল্য সামান্য নহে। বাঙ্গলা ভাষার বিশুদ্ধি নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সাহিত্যিক-গণ তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ভাষা রক্ষণশীল, গতিহীন বাঙ্গালার ভাবপ্রকাশেরই উপযোগী ছিল। পরিবর্ত্তিত ও উন্নতির পথারূঢ় জাতির ভাবপ্রকাশের জন্য পরিবর্ত্তিত উন্নততর ভাষার প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে তাহার অভাব অনু-ভব করিতে দেন নাই; প্রয়োজনের পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালীকে সে ভাষা যোগাইয়াছেন। তিনি পণ্ডিতদিগের ব্যবহৃত ভাষার সহিত জনসাধা-রণের চলিত ভাষা মিশ্রিত করিয়াছেন বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতদিগের ব্যবহৃত বিস্তারবিহীন নিয়ম-নিগড়বদ্ধ ভাষায় নূতন বাঙ্গালার বিচিত্র, সুন্দর, সরস ও সতেজ ভাব বিকশিত হইতে পারিত না। আধুনিক বাঙ্গালীর ভাব প্রকাশের জন্য যে ভাষার প্রয়োজন হইয়াছিল, সে ভাষার সংস্কৃতের শক্তি, গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দ-র্য্যের সঙ্গে সহজবোধ্য সাধারণ ভাষার তেজ ও বৈচিত্র্য মিশ্রিত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই অভাব পূর্ব্বেই বুঝিয়া বাঙ্গালীকে তাহার নবভাব-প্রকাশোপযোগী ভাষা দিয়াছিলেন। আজ যে বাঙ্গলা ভাষা হর্ষে উদ্বেলিত, উৎসাহে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে বিকুণ্ঠিত, দ্বিধায় বিচলিত, ক্রোধে বিকম্পিত, ঘৃণায় সঙ্কুচিত, করুণায় বিগলিত হয়, সে বঙ্গভাষা বঙ্কিম-চন্দ্রের কীর্ত্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সর্ব্বাগ্রে দেশের সাহিত্যিক অভাব বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন, তেমনই সর্ব্বাগ্রে দেশের রাজনীতিক অভাবও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন দেশে রাজনীতিক আন্দোলন যে প্রণালীতে

পরিচালিত হইত তাহার অনুপয়োগীতা এদেশের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'লোকরহস্যে' ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তিনি বিদ্রূপের কশাঘাতে লোককে ইহা বুঝাইয়াছিলেন। বিদ্রূপ প্রতিভাবান লোকদিগের অস্ত্র হইলে প্রতিপক্ষ পরাজয়ে বিশেষ সহায়তা করে। কিন্তু বঙ্কিম-চন্দ্রের গৌরব সংহারে নহে—সৃষ্টিতে, বিসর্জ্জনে নহে—প্রতিষ্ঠায়। সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন অযোগ্যকে নির্দয়ভাবে উন্মূলিত করিয়া যোগ্যকে সাদরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তেমনই অযোগ্যকে বিদ্রূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া যোগ্যকে সাহিত্যের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়াছিলেন স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রেম স্বার্থসংস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না; ত্যাগে তাহার প্রতিষ্ঠা—সাধনায় তাহার বিকাশ। তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে ভয়-ভীত শ্ববৃত্তি ত্যাগ করিয়া গাম্ভীর্য্য-গৌরবান্বিত সিংহবৃত্তি অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার মা'র হস্তে ভণ্ডের ভিক্ষাভাণ্ডও নাই, আর বিদ্রোহীর আত্মবিস্মৃত তরবারি নাই। তিনি 'আনন্দমঠে' ও 'দেবীচৌধুরাণী'তে বুঝাইয়া-ছেন শারীরিক বলের সাধনা করিতে হইবে; কিন্তু নৈতিক বল—সংযম ব্যতীত শারীরিক বল স্থায়ীকার্য্য করিতে পারে না। 'সীতারামে' তিনি দেখাইয়াছেন, অনাচারের স্পর্শে শারীরিক বলের দুর্গচূড়া বজ্রাহত গিরিশিখরের মত ধূলিবিলুণ্ঠিত হয়; উচ্ছৃঙ্খলতা সাধনার অন্তরায়, সিদ্ধির বৈরী। তিনি বুঝাইয়াছেন, নৈতিক শক্তিসাধনার প্রথম সোপান ত্যাগ, কর্ম্মে আত্মসমর্পণ। তাই তাঁহার "সন্তানগণ" সন্ন্যাসী, মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগিনী-দারা-সুত সর্ব্ব-ত্যাগী। তাহারা সংসারত্যাগী ও ইন্দ্রিয়জয়ী। তাহাদের ব্রতভঙ্গের, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত—"জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ।" যে ধনজন, দারাসুত, এসকলকে ভালবাসে, যে আপনাকে ভালবাসে, তাহার স্বদেশভক্তি অসম্পূর্ণ।

এ সাধনায় "জীবন তুচ্ছ" ; সাধককে দিতে হইবে—"ভক্তি।" তাঁহার "সন্তানগণ" দুর্দ্দান্ত দস্যু নহে ; নিষ্ঠুর নরহন্তা নহে ; তাঁহারা সন্ন্যাসী ও সাধক। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, নৈতিক শক্তিসাধনার দ্বিতীয় সোপান সংযম ও পদ্ধতিবদ্ধতা। দেবীর কঠোর শিক্ষায়, সন্তানগণের পরুষ প্রতিজ্ঞায় এবং 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'আনন্দমঠ' পুস্তকদ্বয়ে বর্ণিত পদ্ধতিবদ্ধ কার্য্যে তিনি ইহাই বুঝাইয়াছেন। নৈতিক শক্তিসাধনার তৃতীয় সোপান স্বদেশপ্রেমে, ধর্ম্মভাবে সমাজ-সংস্কার। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে স্বদেশপ্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। 'দেবীচৌধুরাণী'তে ইহার আভাস—'আনন্দমঠে' ইহার বিকাশ। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' কর্ম্মযোগের বিচিত্র ভাব বিবৃত। 'কৃষ্ণচরিত্রে' মূর্ত্ত কর্ম্মযোগের চিত্র চিত্রিত। স্বদেশপ্রেমে এই কর্ম্মযোগের পূর্ণ বিকাশ। "বন্দেমাতরম্" গীতে এই ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নব্য-ভারতের রাজনীতিক গুরু। তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য তাঁহার স্বদেশবাসীকে "নবীন-কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী" মাতৃমূর্ত্তি প্রদর্শন। স্বদেশপ্রেম যত দিন কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য, তত দিন তাহা শক্তিহীন ; যখন হৃদয়ে তাহার স্বরূপ প্রতিভাত হয়, তখনই তাহা মানুষকে চালিত করে, তখনই মানুষ তাহার জন্য জগতে আর সব তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখে। যতদিন মাতৃভূমি পর্ব্বত-কিরীটিনী, সাগর-সুশোভিতা ভূমিখণ্ড মাত্র, যতদিন দেশবাসী কেবল মনুষ্যমণ্ডলী মাত্র, ততদিন স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। যখন মৃণ্ময়ী মা চিন্ময়ীরূপে দেখা দেন, তখন সেই মাতৃমূর্ত্তির দর্শনপুণ্যে মানবের জাড্য-দ্বিধা-সঙ্কীর্ণতা-স্বার্থান্ধতা অরুণোদয়ে রজনীর অন্ধকারের মত দূর হয়। বঙ্কিম বাঙ্গালীকে ও ভারতবাসীকে সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। তাই যেদিন বাঙ্গালী জাগিল, সেদিন একজনের মুখে "বন্দেমাতরম" মন্ত্র উচ্চারিত হইতে না হইতে সমগ্র ভারতবর্ষ সেই মন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই মন্ত্রে ভারতবাসীর ভাব প্রকাশের ভাষা পাইল।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এ জাগরণের বহু পূর্ব্বে মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। "কমলাকান্ত"রূপে তিনি মা'র এই মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। "এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা" দেখিয়া, কাঁদিয়া বাঙ্গালীকে বলিয়াছিলেন—"এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কাল-স্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে এই প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—এই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?" সেই মূর্ত্তিই "সন্তানগণে"র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। "দশভুজ দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শক্র-বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শক্র-নিপ্পীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—নানা-প্রহরণধারিণী, শক্র-বিমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী; দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী; বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী; সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়; কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"

এই মূর্ত্তি দেখিয়াই তিনি যুক্ত করে উর্দ্ধমুখে ডাকিয়াছিলেন—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্তুতে॥"

আর এই মূর্ত্তি দেখিয়া পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে ভারতবাসী গাহিয়াছে—

"বন্দেমাতরম্।"

এই নবজাগরণ কিরূপে আসিবে তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়াছিলেন। সনাতন ধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নহে। "সেই জ্ঞান দুই প্রকার—বহির্বিবষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক

দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই, শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোক-শিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক-শিক্ষায় বড় সুপটু। ইংরাজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম্ম-প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা-আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে। প্রতীচ্য শিক্ষার বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের তড়িৎসঞ্চারে প্রাচীর জড়ত্ব দূর হইয়াছে। ভগীরথানীত গঙ্গার স্পর্শে যেমন সগরসন্তানগণের উদ্ধার সাধিত হইয়াছিল, ইংরাজের আনীত বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে তেমনই ভারতের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে। দেশ নবজীবনে জাগ্রত হইয়াছিল—নবারুণ-কিরণে চক্ষু মেলিয়াছিল। লর্ড মিণ্টোর মত যাঁহারা ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাই স্বীকার করিয়াছিলেন, সমগ্র প্রাচী নবভাবরূঢ় জাগরণ-তরঙ্গে প্লাবিত হইতেছে; তাহাতে প্রাচীর প্রাচীন সংস্কার বিধৌত হইয়া যাইতেছে। জাপানে, চীনে, ভারতে, —সমগ্র প্রাচীতে এই জাগরণের লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে। এ জাগরণ প্রতীচীর সভ্যতার সহিত পরিচয়-প্রসূত, প্রতীচ্য শিক্ষার ফল, বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানলাভের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

দেশে এই নবভাবের আবির্ভাব যে অবশ্যম্ভাবী, ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। মা যে মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন, একদিন যে মা'র সেই মূর্ত্তি তাঁহার স্বদেশবাসী সকলেই প্রত্যক্ষ করিবে তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। সমগ্র দেশের জাগ-রণের পূর্ব্বেও কেহ কেহ তিমিরাবৃত প্রাচীর তোরণে অরুণকিরণ-